ষোড়শ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ্মসংখ্যা ২০১৬

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস প্রকাশিত

প্রবন্ধগ্রন্থ

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

- রবীন্দ্রনাথের ভ্রমণসাহিত্য ১০০৲
- রবিকিরণে নবরত্ন ৬০৲
- রবীন্দ্রকাব্যনাট্য : রূপ ও রূপান্তর ৯০৲
- রক্তকরবী : অলৌ... উদ্ভাসন (সম্পা.) ৩০০৲
- রামমোহন রায় রচিত বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার ও অনূদিত উপনি... (সম্পা.) ১৮০৲

ড. পুলিন দাস রচিত ও সম্পাদিত গ্রন্থ

- মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ ২৪০৲
- দুঃখনিশি অবসান বা... বালা (সম্পা.) ৭৫৲
- নীলবৃত্তান্ত ১৫০৲
- Report of the Indigo Commissio... 1860 275/-

ড. দেবীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় রচিত

- ভারতীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত ১২০৲

ড. সন্তোষকুমার ম...ল ও অনুপ বিশ্বাস সম্পা...

- লালসালু : সমালোচনার ...র্পণে

ড. প্রত্যুষকুমার জানা রচিত

- কথাসাহিত্যিক মতি নন্দী ১৮০৲

চাঁদমালা খাতুন রচিত

- বাংলা সাহিত্যে বারমাস্যা ১২০৲
- মঙ্গলকাব্যে বাংলা ও বাঙালি সমাজ ...

প্রতিযোগিতামূলক গ্রন্থ

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল সম্পাদিত

- নেট-সেট জেনারেল (দ্বিভাষিক) ৪২০৲
- নেট-সেট বাংলা ২য় পত্র প্রথম ভা... ৫৫০৲
- নেট-সেট বাংলা ২য় পত্র দ্বিতীয় ভাগ ৩৫০৲
- নেট-সেট বাংলা ৩য় পত্র ...
- পি. এস. সি বাংলা ৩০০৲
- এস. এল. এস. টি বাংলা (মাধ্যমিক পর্যায়) ৪৮০৲
- এস. এল. এস. টি. বাংলা (উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়) প্রথম ভাগ ৩৫০৲
- এস. এল. এস. টি. বাংলা (উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়) দ্বিতীয় ভাগ ৪৫০৲
- এস. এল. এস. টি. বাংলা (উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়) তৃতীয় ভাগ ১৫০৲

সহায়িকা

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল সম্পাদিত দূরশিক্ষা দিশারী

- রবীন্দ্রভারতী বাংলা এম.এ পার্ট-১ ৩০০৲ পার্ট-২ ৩০০৲
- কল্যাণী বাংলা এম. এ পাট-১ ৩৫০৲ পার্ট-২ ৩০০৲
- বিদ্যাসাগর বাংলা এম.এ পার্ট-১ ৪০০৲

প্রাপ্তিস্থান : দেজ পাবলিশিং, প্রজ্ঞাবিকাশ, ঊষা, জানকী, জয়শ্রী, কম্পিটিটিভ, কলেজ স্ট্রিট

ISSN : 2320-9275

উদ্দালক

ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

বিশেষ সংখ্যা

নারী, তুমি মহীয়সী

সম্পাদক

সন্তোষকুমার মণ্ডল

উদ্দালক

ষাণ্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা

ষোড়শ বর্ষ

২০১৭

বিষয়

নারী, তুমি মহীয়সী

সম্পাদক

ড. সন্তোষকুমার মণ্ডল

সহসম্পাদক

সংঘমিত্রা কর্মকার, সন্দীপ মুখার্জী

উদ্দালক পাবলিশিং হাউস

১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা, কলকাতা-৭০০০৪৯

Uddalak Sahitya Patrika, special issue : Nari, Tumi Mahiyasi, 2017
Edited by Dr. Santosh Kumar Mandal.
Sub-editor : Sanghamitra Karmakar & Sandip Mukherjee

গ্রন্থস্বত্ব : সম্পাদক

ISSN : 23209275

প্রকাশক :
সন্তোষকুমার মণ্ডল
উদ্দালক পাবলিশিং হাউস
১১/৩ উদয়পুর রোড, নিমতা
কলকাতা-৭০০ ০৪৯

মুদ্রক :
নবলোক প্রেস
৩২/২ সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিট
কলকাতা০৭০০ ০০৬

মূল্য : ৫০(পঞ্চাশ টাকা মাত্র)

সম্পাদকীয়

শারোদৎসবের প্রাগ্‌মুহূর্তে মৃদু-মন্দ বাতাসে প্রকৃতি যখন সুবাসিত, তখনই প্রকাশিত হতে চলেছে উদ্দালকের 'নারী, তুমি মহীয়সী' সংখ্যাটি—যার মূল মন্ত্র 'হেথা হতে যাও পুরাতন'। নজরুল ইসলাম তাঁর 'নারী' কবিতায় দেখিয়েছেন প্রকৃতির যা কিছু সৃষ্টির মূলে রয়েছে 'নর-নারী'র মিলিত প্রয়াস। অর্থাৎ মানবসম্পদ বলতে নর-নারীর যুগ্মকর্ম প্রচেষ্টাকেই বোঝানো হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগা দেশে সংসারের চালিকা নারীকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের জাঁতাকলে ক্রমশ বিদ্ধ হতে হয়। এমনকি তাঁর নিজস্ব সত্তার পরিস্ফূটন ঘটানোও যেন 'মহাপাপ!' তাই তার শুধুই পরিচয় কখনও 'পিতার কন্যারূপে, কখনও 'স্বামীর স্ত্রী' হিসাবে, কখনও 'পুত্রের মা' হিসাবে। অর্থাৎ তার প্রকাশ—

'আমার হৃদয় প্রাণ সকলই করেছি দান।
কেবল শরমখানি রেখেছি।
চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে
সযতনে আপনারে ঢেকেছি।'

কিন্তু ভালো করে ভাবলে লক্ষ করা যায় নারীদের এই কমনীয় মনোভঙ্গির নেপথ্যে কাজ করেছে পুরুষ তথা সমাজেরই আরোপিত-বর্বরোচিত মানসিকতার শৈল্পিক ফলশ্রুতি। হ্যাঁ, একথাও ঠিক নারী নিজেও কিয়দংশে এর জন্য দায়ী। সত্যি কথা বলতে কি, নারী নারীর দ্বারা যতখানি লাঞ্ছিত ও অসম্মানিত হয়েছে, পুরুষের দ্বারা ততখানি নয়। আশ্চর্যের বিষয় নারীকে সমাজে, এমনকি সাহিত্যেও সৃষ্ট চরিত্রের মধ্যে অনেকাংশে কোথাও হীন অর্থে, কোথাও লাঞ্ছিত, কোথাও শোষিত, কোথাও অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য হতে যেমন দেখা যায় তেমনি আবার অনেক মহীয়সী নারীর সত্তা 'আমার এই পথ চলাতেই আনন্দ'-কে আনন্দ না ভেবে, তাদের আলোয় আলোয় মুক্তির কথা পাঠকবৃন্দকে মর্মে মর্মে স্বীকৃত করতে বাধ্য করেছেন। সংখ্যাটি সেইসব নারীরই আলোকদীপ্ত বিচ্ছুরণ, খুঁজতে চেয়েছে 'তুমি মোরে পার না বুঝিতে?'-র সদুত্তর।

সদুত্তর খুঁজতে যেসব লেখক-লেখিকাগণ তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ আলোচিত বিষয়ে নিজস্ব অভিমতের প্রকাশ ঘটিয়েছেন, তাতে পত্রিকাটির বিষয় নির্বাচন যেমন সার্থকতা পেয়েছে তেমনি ঋদ্ধও হয়েছে। সংখ্যাটি পাঠে আজকের পাঠকও যদি পঞ্জরে পঞ্জরে পরস্পরকে অনুভব করে, এই সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হয়—'যেখানে নারীরা রয়েছে ঘিরে পৃথিবীর অর্দ্ধেক আকাশ', এবং নারীদের 'মেয়েমানুষ' হিসাবে না ভেবে শুধুই মানুষ হিসাবে প্রতিষ্ঠা করে—তবেই ঈশ্বরের অর্দ্ধনারীশ্বর রূপের পূর্ণ প্রকাশ ঘটবে। আর তখনই এই পত্রিকার প্রাপ্তির ঝুলিও পূর্ণতা লাভ করবে।

'মহীয়সী' শব্দটির অর্থ মহত্তর। সুমহান। মহৎ। স্ত্রীলিঙ্গের মহৎ + ইয়সুন্ প্রত্যয়যোগে প্রথমার একবচনে গঠিত। অর্থাৎ মহৎ নারীর কর্মবৃত্তির প্রকাশ ঘটানোই এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। উদ্দেশ্য সর্ব্বাংশে পৌঁছতে না পারলেও, কিয়দংশ স্পর্শের অনুভূতি পেতে চেয়েছে মাত্র, কিছুটা আলোকপাত করেওছে। সেই আলোকে পাঠকের হৃদয় কিঞ্চিত আলোকিত হলেই আমাদের শ্রম সার্থক হয়।

আর এ কার্য নিরূপণ করতে গিয়ে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও নানা ভুল-ভ্রান্তি ঘটে থাকলে তা পাঠকের ক্ষমাসুলভ দৃষ্টিতে মার্জনা লাভ করবে এই প্রত্যাশা রইল।

সম্পাদক

সূচীপত্র

কৃতিত্বে তুমি অনন্যা — সুতপা পড়িয়া — ৭
স্বধর্মের আলোকে মহীয়সী কুন্তী — রেজিনা কবীর — ১২
মহাভারতের গান্ধারী : নারী তুমি মহীয়সী — সবিতা মণ্ডল — ২১
'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের আলোকে দ্রৌপদী — অরুনিমা ঘোষ — ২৯
কালিদাসের 'শকুন্তলা' ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহীয়সী নারীচরিত্র — মধুরিমা মুখার্জী — ৩২
'রত্নাবলী' নাটিকার 'বাসবদত্তা' ঃ মহীয়সী রাজমহিষী — স্বপ্না রায় চৌধুরী ও ড. অর্ণব পাত্র — ৩৫
হিরন্ময়ী দেবী ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক আলোকিত অধ্যায় — ড. প্রত্যূষকুমার রীত — ৩৯
নারী তুমি মহীয়সী : নটী বিনোদিনী — চাঁদমালা খাতুন — ৪৫
মহীয়সী নারী শৈবলী — জুবিন ইয়াসমিন — ৫৩
অপার মহিমাময়ী অনন্যা নিবেদিতা — পুলিন দাস — ৫৬
সন্ত মাদার টেরেসা ঃ ভালোবাসার সেবাদূত — ড. সুরঞ্জন মিদ্দে — ৬০
ভারতের সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে বাংলার বীরাঙ্গনাদের কথা : ইতিহাসের একটি অবহেলিত অধ্যায় — তনুশ্রী বিশ্বাস — ৬৯
'নারী তুমি মহীয়সী' : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য — মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায় — ৮৯

কৃতিত্বে তুমি অনন্যা

সুতপা পড়িয়া

বিধাতার এক অনন্যা সৃষ্টি হল নারী। নারী এবং পুরুষ যে সমাজের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল তার প্রমাণ আমরা বৈদিক সাহিত্য, উপনিষদ এবং পরবর্তীকালের কাব্যাদিতেও লক্ষ্য করি। নারী সবসময় পুরুষের কাছে থেকে প্রতিনিয়তই তাকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। সমাজের কল্যাণ সাধনে তার ভূমিকা কোন দিনই নগন্য ছিল না। নারী এবং পুরুষের সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই যে সমাজের উন্নতি সম্ভব এ কথা সকল মহান চিন্তাবিদেরা স্বীকার করে থাকেন। এইজন্য নারী কখনই হেয় হতে পারে না। তাই ধর্মশাস্ত্রে উক্ত হয়েছে —

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।।"

(মনুসংহিতা- ৩/৫৬)

আবার স্বামী বিবেকানন্দের উদাত্ত কণ্ঠেও ধ্বনিত হয়েছে —

"হে ভারত ! ভুলিও না– তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী।"

(স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা, ষষ্ঠ খণ্ড 'স্বদেশ মন্ত্র,' "বর্তমান ভারত")

ভারতীয় সমাজে নানা পরিবর্তন সাধিত হলেও ভারতীয় নারীর জ্ঞানগরিমা, কর্মনৈপুণ্য, স্নেহ, সহিষ্ণুতা, পতিব্রত্য, পরার্থপরতার আদর্শ আজও অম্লান হয়ে রয়েছে। শুধু তাই নয়, ত্যাগ ও তিতিক্ষার মহান আদর্শে সর্বদা তার মহিমা আজও ধ্বনিত হয়।

বৈদিক যুগে বেশ কয়েকজন বিদুষী রমণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে অনেকে আবার বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্ট্রী ছিলেন। সেই মন্ত্র দ্রষ্ট্রী নারী ঋষিদের মধ্যে আম্ভৃণীবাক্, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা, কাক্ষীবতী, ঘোষা ও শ্রদ্ধাকামায়নীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঋগ্বেদের দেবী সূক্তের দ্রষ্ট্রী হলেন ব্রহ্মবাদিনী ঋষি বাক্। এই বাক্ অম্ভৃণ ঋষির কন্যা। এই সূক্তটি একটি আধ্যাত্মিক সূক্ত। এই সূক্তে ঋষি নিজেকে দেবতার সাথে এক করে নিজের স্তুতি করেছেন। তাই দেবী সূক্তে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ ঋষি হয়ে নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করে নিজেকেই দেবতা রূপে ব্যক্ত করেছেন। এইজন্য তিনি স্বয়ং স্বমহিমা প্রকাশ করে বলেছেন —

"অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরা
ম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভ-
র্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা।।"

(ঋগ্বেদ, ১০/১২৫/১)

আমি রুদ্র রূপে, বসু রূপে, আদিত্য ও বিশ্বদেবতা রূপে বিচরণ করি। আমি মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধারণ করি।

ঋষি শৌনক দেবতা বিষয়ক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থটির নাম হল 'বৃহদ্দেবতা'। বৈদিক দেবতা বিষয়ক এই 'বৃহদ্দেবতা' গ্রন্থে মন্ত্রদ্রষ্টা নারী ঋষিদের ব্রহ্মবাদিনী হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই গ্রন্থে সাতাশ জন নারী ঋষির নাম উল্লিখিত হয়েছে।

যজ্ঞের ব্যাপারে নারীর ভূমিকা ছিল অপরিহার্য। এই বিষয়ে পত্নী শব্দটির উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই পত্নী শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে একটি সূত্র উল্লিখিত হয়েছে। সূত্রটি হল "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে"। এই সূত্রটির অর্থ সম্পর্কে বলা হয়েছে-স্বামীকে কেবল যজ্ঞ কর্মে সহায়তা করার অর্থেই পতি শব্দের সঙ্গে "ন" প্রত্যয় যুক্ত হয়। সুতরাং ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী 'স্ত্রী' শব্দের সমানার্থক 'পত্নী' শব্দের অর্থ হল যজ্ঞ কর্মে পতির সহযোগিনী। শতপথ ব্রাহ্মণেও বলা হয়েছে- স্ত্রী হল যজ্ঞের এক অর্ধাংশ। তাই সেখানে উক্ত হয়েছে-

"অর্থো হ বা এষ যজ্ঞস্য যৎ পত্নী।"

(শ.ব্রা. ৫/২/১/৪)

প্রত্যেক যজ্ঞেই পত্নী সংযাজ নামক এক যাগ অনুষ্ঠিত হয়। এই যাগে যজমান পত্নীকে বেদ মন্ত্র পাঠ করতে হতো। এখানে পত্নীর স্থান ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যজ্ঞ বেদীর মধ্যে পুরোহিতদের সঙ্গে আসন গ্রহণ করতেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থেও এর স্বীকৃতি আছে।

সূর্য কন্যা সূর্যার বিবাহ বিষয়ক অনেক বৈদিক মন্ত্র আছে। এই সব বৈদিক মন্ত্রের অনেকগুলি আজও হিন্দুরা বিবাহের সময় উচ্চারণ করে থাকেন। ঋকবেদের ঋষি নববধূকে আর্শীবাদ করে বলেছেন-

"সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রবাং ভব।
ননান্দরি সম্রাজ্ঞী ভব সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু।।"

(ঋগ্বেদ ১০/৮৫/৪৬)

অর্থাৎ তুমি শ্বশুরের উপর প্রভুত্ব কর, শ্বশ্রূকে বশ কর, ননদ ও দেবরগণের উপর সম্রাজ্ঞীর ন্যায় হও।

সামরিক শিক্ষা লাভ করার প্রথাও যে বৈদিক যুগে ছিল তা ঋগ্বেদের মন্ত্র থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয়। তাই তো যুদ্ধক্ষেত্রে রমণীদের অপূর্ব বীরত্ব ও যুদ্ধ কর্মে নিপুণতার

পরিচয় পাওয়া যায়। তখন অনেক খ্যাতনামা রাজণ্যবর্গের মহিষীগণও যুদ্ধের পুরোভাগে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ করতেন। রাজা নমুচির আদেশে তাঁর মহিষী এক ভয়ঙ্কর ও দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। আবার খেলের মহিষী বিশ্পলার বীরত্ব ব্যঞ্জক কার্যাবলী ঋগ্বেদের আশ্বিন সূক্তে উল্লিখিত হয়েছে। একদা তিনি যখন যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুসেনার সঙ্গে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে রত ছিলেন সেই সময় তিনি উরুতে গুরুতর আঘাত পান। ফলে তাঁর একটি উরু অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হয়েছিল এবং লৌহ নির্মিত একটি কৃত্রিম উরু তাঁর দেহে শল্যচিকিৎসকগণ কর্তৃক সংযোজিত হয়েছিল।

"সদ্যো জংঘামায়াসীং বিশ্পলায়ৈ ধনে হিতে
সর্তবে প্রত্যধত্তম্"

(ঋগ্বেদ- ১/১১৬/১৫)

প্রাচীনকালে মহর্ষি জনকের রাজসভায় কয়েকজন মহীয়সী নারীকে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে লক্ষ্য করা যায়। সেই সময় বালব্রহ্মচারিণী ক্ষত্রিয়া নারী সুলভা রাজর্ষি ধর্মধ্বজের সঙ্গে দার্শনিক বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। এই সুলভা আবার সর্ব বেদে পারঙ্গমা এবং যোগসিদ্ধা ছিলেন। আবার ঐ সময়ে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী সে যুগের অপরাজেয় পণ্ডিত মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের কাছে ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার ব্যাপারে চরম মীমাংসার জন্য তাঁকে তর্কযুদ্ধে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে না পেরে তাঁকে নিরস্ত করার জন্য ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন যে, যা প্রশ্নের যোগ্য নয়, উত্তরের অতীত বিষয়ে যদি সে প্রশ্ন করে তাহলে তাঁর মস্তক খসে পড়বে। "গার্গি, মাতিপ্রাক্ষীর্মা তে মূর্দ্ধা ব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতামতিপৃচ্ছসি, গার্গি মাতিপ্রাক্ষীরিতি।"

(বৃহদারণ্যক উ. ৩/৬/১৭১/১)

তখন গার্গী ক্রুদ্ধ যাজ্ঞবল্ক্যের এইরূপ কথা শুনে তাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত হন। পরে অবশ্য আর এক বার সভাতে ব্রাহ্মণদের অনুমতি নিয়ে সেই গার্গী ব্রহ্ম বিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্যকে দুটি প্রশ্ন করেছিলেন। এবার কিন্তু তিনি তাঁর কাছ থেকে সন্তোষজনক উত্তর পেয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ বলে মেনে নিয়েছিলেন।

এই সময়ে নারীরা গৃহে আবদ্ধ থেকে কেবলমাত্র গৃহকর্মই যেমন করতেন না তেমনি সংসারের ভোগবিলাসের মধ্যেও মগ্ন থাকতেন না। তখন কোন কোন নারী সংসারের ভোগবিলাসের উর্ধ্বে উঠে বিষয় সম্পদ পরিত্যাগ করে ব্রহ্মবাদিনী হতেন এমন দৃষ্টান্তও আছে। এইবিষয়ে যাজ্ঞবল্ক্য ও মৈত্রেয়ীর উপাখ্যানটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একসময় যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা গ্রহণের পূর্বে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি দুই স্ত্রী মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নীর মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার জন্য মনস্থ করেন। দুই স্ত্রীর মধ্যে ব্রহ্মবাদিনী পত্নী মৈত্রেয়ী ছিলেন অসামান্যা। রাজকন্যা হওয়ায় আশৈশব ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে লালিতা হয়েও স্বেচ্ছায় কৃচ্ছ্রব্রতা অরণ্যচারিণী তিনি যাজ্ঞবল্ক্যকে পতিত্বে বরণ করেছিলেন। তিনি তাঁর স্বামীর সমস্ত সম্পত্তি ভাগের কথা শুনে স্বামীকে তিনি এইরূপ

প্রশ্ন করেছিলেন- হে স্বামি! এই সম্পত্তি দিয়ে আমি কি মৃত্যুকে অতিক্রম করতে পারবো?

"যন্নু ম ইয়ং ভগোঃ সর্ব্বা পৃথিবী বিত্তেন পূর্ণা স্যাৎ কথং যেনামৃতং স্যামিতি। নেতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ।" (বৃহদারণ্যক উ. ২/৪/১০৮/২)

অর্থাৎ ধনসম্পদে পূর্ণা এই সমস্ত পৃথিবী যদি আমার (হস্তগত) হয় তবে তার দ্বারা আমি মৃত্যুরহিত হতে পারবো কি? তার উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বললেন-না, তুমি পারবে না। তখন মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করলেন-

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্।"

এইরূপ প্রশ্ন মানবসভ্যতার আদি যুগ থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কেউ করেছে বলে আমার মনে হয় না। আজও যেন সেই প্রশ্ন আকাশে, বাতাসে ভেসে বেড়ায়-

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্যাম্, যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রুহীতি।" (বৃহদারণ্যক উ.৪/৫/৪)

তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দেখা যায় যে মন্ত্র পাঠে, হোমে, আহুতিতে স্ত্রী সমানভাবে যোগ দিতে পারতেন। আবার অত্রির পত্নী অনসূয়া শুধু সর্বশাস্ত্রজ্ঞা সুপণ্ডিতা ছিলেন না তপঃপ্রভাবে অনাবৃষ্টি নিবারণ করতে যেমন পারতেন তেমনি ঋষিদের তপোবিঘ্ন নিরসনও করতে পারতেন। এছাড়া মতঙ্গ আশ্রমের পরিচারিকা হীনবংশোদ্ভবা তপঃসিদ্ধা নিত্যধর্মনিরতা তপস্বিনী শবরী সকলের কাছে যে নমস্যা ছিলেন তাও জানা যায়।

প্রাচীন যুগে নারীরা যে অধ্যাপনা করতেন তার প্রমাণ আচার্যা এবং উপাধ্যায়া- এই শব্দ দুটির উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। তাঁরা ছাত্রীদের পড়াতেন। তাই পাণিনির যুগে মেয়েরা নারী গুরুর কাছে বেদ অধ্যয়ন করতে পারতেন।

রামায়ণে সীতাকে আদর্শ রমণীরূপে দেখানো হয়েছে। সেই সময়ে পত্নীরা স্বামীর সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক কাজকর্মের সমান অংশীদার ছিলেন বলে তাঁদের সহধর্মিণী বলা হোত। তাঁরা যজ্ঞের সময় স্বামীর পাশে পাশে যেমন অবস্থান করতেন তেমনি সুখে, দুঃখে, আপদে-বিপদে সবসময় স্বামীর কাছে কাছে থাকতেন। সেইজন্য রাম বনবাসে যাওয়ার সময় সীতা কারও নিষেধ না মেনে স্ত্রী ধর্ম পালনের জন্য স্বামীর সঙ্গে বনে গিয়েছিলেন।

মহাভারতের যুগে যে সব নারী চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের মধ্যে সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, কুন্তী ও গান্ধারী প্রভৃতি নারীরা পাণ্ডিত্যে, তেজস্বিতায়, মহত্বে, ত্যাগে ও যুক্তিনিষ্ঠ কথাবার্তার নিরিখে আদর্শ রমণীরূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন। এদের মধ্যে মদ্ররাজ কন্যা সাবিত্রীর যুক্তি ও তর্কের নিপুণতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁর পাতিব্রত্যে সন্তুষ্ট যমরাজ যখন তাঁকে চারটি বর দিতে চাইলেন তখন তিনি এক এক করে তিনটি বর চাওয়ার পর চতুর্থ বরে এমন অকাট্য যুক্তি দেখালেন যে যমরাজ বাধ্য হয়ে তাঁর স্বামী সত্যবানের পুনর্জীবন দান করলেন। এছাড়া আমরা আরও দেখতে পাই যে গান্ধারী, দ্রৌপদী প্রভৃতি বুদ্ধিমতী রমণীরা রাজনীতিজ্ঞ রাজগণকেও কর্তব্য নির্ধারণে সহায়তা করতেন এবং সদুপদেশও দিতেন। বিদুষী ও তেজস্বিনী কুন্তী আশৈশব পিতৃহীন পাণ্ডবদের পিতার মতো শিক্ষা দিয়েছিলেন এবং নিজগুণে সন্তানদের কাছে আদর্শ মাতা হিসাবে শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, ক্ষত্রিয় বীর নারীর মতো ধর্মযুদ্ধে সন্তানদের অনুপ্রেরণা দিতেও কুণ্ঠিতা হতেন না।

প্রাচীন যুগে ব্যতিক্রমী নারীদের যে দেখা যায় না তা নয় তথাপি যে সকল নারী কর্তব্যে, নিষ্ঠায়, কর্মনৈপুণ্যে, সত্যবাদিতায়, জ্ঞানগরিমায় শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করেছিলেন সেই সকল মহীয়সী নারীদের মধ্যে কেবলমাত্র কয়েকজনের নাম উল্লিখিত হলেও এইরকম আরও অনেক নারী আছেন যাঁরা আজও আমাদের কাছে নমস্যা ও শ্রদ্ধেয়া।

গ্রন্থপঞ্জী

দত্ত রমেশচন্দ্র, 'ঋগ্বেদসংহিতা', প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড, হরফ প্রকাশনী, এ ১২৬ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কোল-৭

ভট্টাচার্য শাস্ত্রী সুখময়, 'মহাভারতের চরিতাবলী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কোল-৯

শ রামেশ্বর, 'সংস্কৃত ও প্রাকৃত্য সাহিত্য সমাজচেতনা ও মূল্যায়ন', সাহিত্যশ্রী, ৭৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কোল-৯

বসু যোগীরাজ, 'বেদের পরিচয়, সংস্কৃত পুস্তক ভণ্ডার, ৩৮, বিধান সরণি, কোলি-৬

সাংখ্য বেদান্ত তীর্থ দুর্গাচরণ, 'বৃহদারণ্যকোপনিষদ্', দেবসাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

স্বামী গম্ভীরানন্দ, 'উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী', উদ্বোধন কার্যালয়, ১, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কোল-৩

স্বধর্মের আলোকে মহীয়সী কুন্তী

রেজিনা কবীর

অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ, সরোজিনী নাইডু কলেজ ফর উইমেন

নবম ও দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় পাঠ্যসূচীর অন্তর্গত "কর্ণ কুন্তী সংবাদ" থেকেই কর্ণ ও কুন্তীর সাথে বিশেষ রূপে পরিচয়। বলতে দ্বিধা নেই একজন নারী হিসেবে স্বাভাবিকভাবে একাধারে নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে সচেতনতা ও অন্যদিকে মা হিসাবে একজন নারীর তার সন্তানের প্রতি দায়বদ্ধতার অস্পষ্ট ধারণা থেকে কুন্তী চরিত্রটিকে নিতান্ত দায়িত্বজ্ঞানহীন লঘু স্বভাবের রমণী রূপেই বোধ হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই প্রশ্ন বার বার তাড়ণা করেছে যে, কর্ণের প্রতি সমগ্র সমাজের যে অপমান, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনা তা কি শুধু তার একার ? তার কোন প্রভাব বা জ্বালা কি তার মা কুন্তীকে দগ্ধ করেনি ? কুন্তী কি তার জেষ্ঠ্য সন্তানকে তার প্রাপ্য মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টাই কখনো করেননি?

মহাভারতের বিভিন্ন নারী চরিত্রের মধ্যে কুন্তী অন্যতমা ও মহীয়সী। স্বয়ং কৃষ্ণ কুন্তীকে বলেছেন, 'আপনার ন্যায় মহীয়সী কে আছেন?' কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব তথা নৈতিক অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তার কৃত কর্তব্যই প্রধান নৈতিক মানদণ্ডরূপে বিবেচিত হয়। সুতরাং কুন্তী চরিত্র বিশ্লেষণ যা এই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় সে ক্ষেত্রেও এটি সমানরূপেই প্রযোজ্য। কিন্তু প্রশ্ন হল মানুষের নৈতিক কর্তব্য কী ? মহাভারত অনুসারে স্বধর্ম পালনই নৈতিক কর্তব্য। সেই কারণে এই প্রবন্ধটিতে প্রথমেই স্বধর্ম বলতে কি বোঝানো হয়েছে তার আলোচনা করা হয়েছে এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কুন্তী জীবনের প্রতিটি স্তরে কতটা কর্তব্যে অবিচল থেকেছেন তারই বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রায়শই আমাদের ইচ্ছে ও কর্তব্যের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। এমত অবস্থায় মানুষের কি করণীয় ? অর্থাৎ ইচ্ছা প্রণোদিত কর্ম কোন্ আদর্শ অনুসারে নিষ্পন্ন হবে ? — এই প্রশ্নের সম্মুখীন আমাদের প্রায়শই হতে হয়।

এই নৈতিক প্রশ্নের উত্তর মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ চর্চা করেছেন, যার সারাংশ হল — নিজ ধর্ম অনুমোদিত কর্ম করা কর্তব্য, তা থেকে বিরত থাকা উচিত নয়। কর্ম নয়, কর্মফল ত্যাগ করাই আদর্শ ধর্ম। তাতে কর্তব্যচ্যুতি

ঘটে না, উপরন্তু কর্মের ফলের প্রতি উদাসীন থাকার দরুণ কর্মফলজাত সুখ-দুঃখের দ্বারা উৎপীড়িত হতে হয় না. এই মূল বক্তব্যটি গীতায় নিম্নরূপে নির্দিষ্ট হয়েছে —

'কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূমা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্মণি।।' ২।।৪৭

— অর্থাৎ কর্মেই তোমার অধিকার, কর্মফলে কখনও তোমার অধিকার নেই। কর্মফল যেন তোমার কর্মপ্রবৃত্তির হেতু না হয়, কর্মত্যাগেও যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।

'নৈতিক আদর্শ কী?'- এই প্রশ্নটি দুভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে — একটি যুক্তির ভিত্তিতে ও অন্যটি কর্মের ভিত্তিতে। এই দুটি পদ্ধতি যথাক্রমে সাংখ্যরীতি ও যোগরীতি নামে প্রসিদ্ধ। সাংখ্যরীতির অর্থ হল বুদ্ধির দ্বারা বিচার করে যে আদর্শ পাওয়া যায় তদনুসারেই কর্মসম্পাদন করা কর্তব্য; আর যোগরীতির আলোচ্য বিষয় হ'ল কর্তব্য কর্ম সম্পাদনের দৃষ্টিভঙ্গী কী হবে।[২]

সাংখ্যরীতি অনুসারে নিজ স্বধর্ম অনুসারে কর্ম সম্পাদনই মানুষের নৈতিক কর্তব্য। যোগরীতি অনুসারে কর্মফলের আকাঙ্খা ত্যাগ করে কর্মফল সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে নিজ বিহিত ধর্মানুসারে যা কর্তব্য তাই পালন করা আদর্শ কর্মনীতি।[৩] প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা হয় স্বধর্ম বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

সত্ত্ব, রজ ও তম — প্রকৃতির এই তিনটি গুণের বৈষম্য অনুসারে মানব প্রকৃতিকে চারভাগে ভাগ করা হয়। যে প্রকৃতি সত্ত্বপ্রধান তার নাম ব্রাহ্মণপ্রকৃতি, সত্ত্বামিশ্রিত রজঃপ্রধাণ প্রকৃতির নাম ক্ষত্রিয়প্রকৃতি, তমোমিশ্রিত রজঃপ্রধান প্রকৃতি বৈশ্যপ্রকৃতি। এবং রজোমিশ্রিত তমঃপ্রধাণ প্রকৃতির নাম শূদ্রপ্রকৃতি। কোন বিশেষ প্রকৃতিবিশিষ্ট সমস্ত লোককে বর্ণ বলে যেমন ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি-বিশিষ্ট সমস্ত লোক ক্ষত্রিয় বর্ণ নামে অভিহিত হন। মানুষের কর্মও তার প্রকৃতি অনুসারেই নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। প্রত্যেক বর্ণের প্রকৃতি এবং তদনুযায়ী কর্মই তার স্বধর্ম।[৪]

এখন বিবেচ্য একজন ক্ষত্রিয় কুলজাতা নারী রূপে কুন্তী তাঁর জীবনের নানান স্তরে তাঁর কর্তব্যে কতখানি অবিচল থাকতে পেরেছেন?. সর্বাগ্রে এক ক্ষত্রিয় পরিবারে জন্মানো শিশুরূপে, কৈশোরে তার পালক পিতার প্রতি কর্তব্য পালন, এক ক্ষত্রিয় কুলবধূরূপে তাঁর ভূমিকা ও সর্বশেষে একজন ক্ষত্রিয় মাতারূপে তাঁর সন্তানদের প্রতি কর্তব্য তিনি কতটা ধর্মানুসারে পালন করলেন- তার দ্বারাই তাঁর চরিত্রের মূল্যায়ণ সম্ভবপর।

পরবর্তী অংশে কুন্তীর জীবনের এই চারটি স্তরেই তাঁর কৃত কর্তব্যের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এবং দেখা যায় জীবনের প্রতিটি পর্যায়েই তিনি তাঁর ধর্মে অবিচল থেকে তাঁর স্বধর্ম পালন করেছেন।

সাম্প্রতিক মনোস্তাত্ত্বিক গবেষণায় এটি প্রমাণিত যে, ব্যক্তির চরিত্র গঠনের অনেকাংশ নির্ভর করে তার শৈশবের ওপর। শৈশব অবস্থাতে যে শিশু পিতা-মাতার কাছে অনেক বেশি কাঙ্খিত তার নিজের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী যেমন হবে, অপর

এক শিশু যে পিত্রা মাতার কাছে কাঙ্খিত নয়, তার জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী ততখানি সদর্থক হবে না।[৫]

কুন্তীর চরিত্র বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রেও এই মনোস্তাত্ত্বিক তত্ত্ব বিবেচনীয়। নিজের শৈশবাবস্থা সম্পর্কে কুন্তী নিজে যা ব্যক্ত করেছেন তা তাঁর ভাষায় বললে হয়– বাপের বাড়ি বলো আর শ্বশুর বাড়ি বলো-কোনও জায়গাতেই তাঁর কপালে সুখ লেখা ছিল না।[৬] দুজায়গাতেই তাঁর কপালে জুটেছে লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা– 'সাহং পিত্রা চ নিকৃতা শ্বশুরৈশ্চ পরন্তপ।'[৭] কেন তাঁর এই আক্ষেপ? তার বিচার করতে গেলে কুন্তীর শৈশবাবস্থার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। কুন্তীর শৈশব সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত ভাষায় বলা যায় তিনি আর্যক শুরের ঔরসজাত প্রথম সন্তান 'পৃথা' যাকে তিনি সানন্দে দান করেছেন তাঁরই নিঃসন্তান সুহৃদ কুন্তিভোজকে। পালক পিতা কুন্তিভোজের নামানুসারেই পৃথা কুন্তী নামে আখ্যায়িত হন।[৮] উপরিউল্লিখিত শ্লোকে কুন্তীর যে অভিঘাত তাঁর পিতার উদ্দেশ্যে বর্ষণ করেছেন তিনি তাঁর পালক পিতা কুন্তিভোজ নন। এই শ্লোকে তিনি তাঁর জন্মদাতা পিতা আর্যক শূরের কথা বলেছেন।

যখন তাঁকে দান করা হয়, তখন তিনি নিতান্ত অবোধ শিশু ছিলেন না। মহাকবি লিখেছেন - তাঁর তখন বাচ্চাদের খেলনা নিয়ে খেলার বয়স হয়ে গেছে। অর্থাৎ যে বয়সে পৃথা তার পিতা-মাতার স্নেহসম্পদ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। এই দান প্রসঙ্গে কুন্তী নিজে বলেছেন 'ধনং বৃত্তৈরিবর্পিতা'[৯]- আমাকে দিয়ে দিলেন যেন আমি একটা টাকার থলে। পৃথার এই উক্তি প্রমাণ করে যে তাঁকে নিতান্তই সম্পদের মতো দান করা হয়েছিল। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে বলতে হয় যে শিশু তার পিতামাতা সম্পর্কে সচেতনই নয়, তারপক্ষে অন্য কাউকে পিতামাতার আসনে বসানো যতখানি সহজ; ঠিক ততখানিই কষ্টকর সেই শিশুর পক্ষে অন্য কাউকে পিতা বা মাতার স্থান দেওয়া, যে পিতা-মাতার স্নেহ সম্পদ সম্বন্ধে বুঝতে শিখেছে, অনুভবে ও বোধে যার পিতামাতার অপত্য স্নেহ প্রাঞ্জল।

নিতান্ত শিশু বয়সে আর্যক শূরের প্রথমা সন্তান পৃথা কুন্তিভোজের স্নেহ ও আহ্লাদে ভোজবাড়ির সমস্ত আচার ব্যবহার রপ্ত করে কুন্তীতে পরিণত হয়েছেন সাবলীল ভাবেই। কিন্তু জন্মদাতা পিতা সম্বন্ধে তাঁর সচেতনতা ও অভিমান দুই রয়ে গেছে। একটি শিশু যার খেলনা নিয়ে খেলার বয়স হয়ে গেছে তার নিজের পিতা-মাতার সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতনতা থাকে। এমত অবস্থায় যদি তাকে দান করে দেওয়া হয়– তাহলে তার মানসিক বিকাশ যে আর পাঁচটি শিশুর মতো সরলরেখায় হবে না, তা অতি সহজেই অনুধাবন করা যায়। পৃথার কুন্তীতে রূপায়ণের সাবলীলতার মধ্যেই তার পিতৃআজ্ঞা পালনের দায়ভার প্রতিফলিত হয়। এক পিতা দান করেছেন আর অপর পিতা গ্রহণ করেছেন কিন্তু শিশুমনের নিরাপত্তাবোধের অভাব একরাশ অভিমানের সঞ্চার করেছে তার জন্মদাতার প্রতি। তৎসত্ত্বেও কোথাও তিনি কুন্তিভোজকে পিতারূপে অস্বীকার করে তাঁর পিতার দেওয়া বচনকে মিথ্যা হতে দেননি। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভোজগৃহে কুন্তীর আধিপত্য ও দায়িত্বভার থেকে। এমনকি কুন্তিভোজও তার ওপর অনেকটাই নির্ভর করতেন, নিম্নে বর্ণিত উপাখ্যান তার প্রমাণ স্বরূপ বলা যায়।

শৈশব পেরিয়ে যখন সবে কুন্তী কৈশরে পদার্পন করেছেন সেই সময় কুন্তিভোজ তাঁর কাঁধে এক বিশেষ দায়িত্ব অর্পন করেন। নানাবিধ শর্তসাপেক্ষে দুর্বাশা মুনি কুন্তিভোজের আতিথ্য গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। দুর্বাশা মুনির স্বেচ্ছাচারিতা সম্পর্কে বিদ্বৎজনেরা সকলেই অবগত। কুন্তিভোজ কুন্তীকে তাঁর সেবার দায়িত্ব অর্পণ করলেন। এই দায়িত্বভার দেওয়া প্রসঙ্গে একটি জিজ্ঞাসা জাগে নিজের ঔরসজাতা সন্তানকেউ কি তিনি এই দায়িত্বভার নির্দ্বিধায় তুলে দিতে পারতেন? সে বিষয়ে সংশয় দেখা দেবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা কুন্তিভোজ যখন কুন্তীকে এই দায়িত্বভার অর্পণ করছেন তার সাথে দেওয়া সতর্কবার্তার মধ্যে কোথায় যেন কুন্তীর বংশ পরিচয়ের আভাস পাওয়া যায়।

কুন্তিভোজের সতর্কবার্তা মহাকাব্যের ভাষায় ব্যক্ত করলে, তিনি বলেন 'দৌষ্কুলেয়া বিশেষেণ কথঞ্চিৎ প্রগ্রহং গতাঃ। বালভাবাদ্ বিকুর্বন্তি প্রায়শঃ প্রমদাঃ শুভে।'[১০] অর্থাৎ জানো তো, মন্দ এবং নীচ বংশের মেয়েদের যদি খানিকটা আচার-নিয়মের মধ্যে রাখা যায় তবে তারা চপলতা বশত যা করা উচিত নয়, তাই করে ফেলে। দুর্বাশা মুনির দেখাশোনার দায়িত্বভার অর্পণের সাথে এই সতর্ক বার্তার অর্থ কী? এর অর্থ কুন্তী করতেই পারেন যে নিয়ম আচারের শৃঙ্খলের মধ্যে থেকে যদি কিছু চপলতা ঘটে তবে তার দোষ বংশের অর্থাৎ কুন্তী যে বংশে জন্মেছেন, সেই বংশের।[১১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে তাঁর জন্মদাতা পিতা তাঁর সাথে আত্মীয়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করে সানন্দে ধনরত্নের ন্যায় নাম কেনার জন্য তাকে দান করছেন। অপরপক্ষে, কুন্তিভোজ তাঁকে অতি আহ্লাদে মানুষ করলেও তাঁর দোষের বিচারের সময় অনায়াসেই তাঁর জন্মকূলের প্রসঙ্গ উত্থাপণ করতে দ্বিধা করছেন না। কুন্তীর অবস্থান যেন নিছকই এক বস্তুসত্ত্বায় পরিণত হয়েছে যার সত্ত্বাধিকার সুবিধেমত বরণ করা যেমন যায় তোমন অনায়াসে অস্বীকার করতেও কেউ দ্বিধাবোধ করেন না।

কুন্তিভোজ কুন্তীর ওপর যে দায়িত্ব অর্পণ করেছেন তা পিতার আদেশ অপেক্ষা অনেক বেশি রাজাজ্ঞাতেই পর্যবসিত হয়েছে। এই মতের সমর্থন পাওয়া যায় কুন্তীর আশ্বাসবাণীতে। কুন্তী বলছেন 'বিশ্রব্ধো ভব রাজেন্দ্র'[১২]— আপনার বাড়িতে বামুন ঠাকুরের কোন অসন্তোষ ঘটবে না। তিনি আরো বললেন আমার জন্য আপনি অতিথি-ব্রাহ্মণের কাছ থেকে যে কোনও ব্যথা পাবেন না— সে কথা আমি হলফ করে বলতে পারি[১৩]– ন মৎকৃতে ব্যথাং রাজন্ প্রাপ্স্যসি দ্বিজসওমাৎ। এই বাক্যগুলির মধ্যে 'রাজেন্দ্র' শব্দের প্রয়োগ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। উক্ত শব্দের মধ্যেই লুকিয়ে আছে কুন্তীর অনাত্মীকরণের বীজ, তিনি সহজ স্বাভাবিক কন্যাজনোচিত মমতায় পিতার সম্মানরক্ষার্থে বা তুষ্টি বিধানের জন্য এই দায়িত্বভার নেননি বরং এই দায়িত্ব তিনি রাজার অনুগত রাজ কর্মচারীর ন্যায় মাথা পেতে নিয়েছেন।[১৪] অতএব বলা যায়, এই দায়িত্বভার কুন্তী বহন করেছেন একজন ক্ষত্রিয় কূলজাতা রূপে নিজ স্বধর্ম পালনের দায়বদ্ধতার খাতিরে, কোন ফলের আশায় নয়।

বৎসরকাল অতিবাহিত হওয়ার পর দুর্বাশা মুনি যখন তুষ্ট হয়ে কুন্তীকে বর চাইতে বলেছেন — তখন কুন্তীর মুখে শোনা যায় — ত্বং প্রসন্নঃ পিতা চৈব কৃতং বিপ্

কুন্তীকে আমরা আরো দায়িত্বশীল ভূমিকায় দেখি যেখানে তিনি কর্ণের কাছে তার গর্ভধারিণী রূপে নিজ পরিচয় দিয়ে তাকে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু যে শিশুকে জন্মলগ্নে নিরুপায় হয়ে জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল, তাকে যে আর সারাজীবনে ধরার শতচেষ্টাতেও ধরা যায় না, তা বুঝতে পারলেন। কুন্তীর এই প্রস্তাবে কর্ণ জানালেন— পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে কেবল অর্জুনকেই তিনি বধ করবেন, সমর্থ হলেও অন্য পাণ্ডবদের তিনি বধ করবেন না। এই যুদ্ধে হয় অর্জুন তার হাতে হত হবে, নতুবা সে অর্জুনের হাতে নিহত হবে। তাতে কুন্তী পঞ্চপুত্রেরই জননী থাকবেন— নিরর্জুনা সকর্ণা বা সার্জুনা বা হতে ময়ি[২৭]- অর্থাৎ আপনি নিরর্জুনা হলে কর্ণ আপনার থাকবে, আর আপনি অকর্ণা হলে অর্জুন আপনার থাকবে। যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এবং একসাথে যে তিনি তাঁর ছয় সন্তানের জননী হতে পারবেন না তাও দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট। আর দেখা হয় কি না হয় – শেষবারের মতো কর্ণকে একবার আলিঙ্গন করলেন কুন্তী। কিন্তু ক্ষত্রিয় পুত্র যেমন সত্যচ্যুত হল না, ক্ষত্রিয়া রমণীয় তেমনি তাঁর ভবিষ্যৎ ভাবনা থেকে সরলেন না। কর্ণের হাতে অর্জুন ভিন্ন অন্য কোন পাণ্ডবের যেন কোন ক্ষতি না হয়- এই আশ্বাস নিয়ে ফিরলেন।[২৮]

এর পরের পর্যায়ে আমরা কুন্তীর যে রূপ পাই তা তাঁর মাতৃত্ব ধর্ম পালনের মধ্যে দিয়ে কুন্তী চরিত্রের যে গভীরতাকে প্রকাশ করে তা যেন এই চরিত্রের উত্তোরনের মধ্যে দিয়ে তাঁর মুক্তির দার উন্মুক্ত করেছে। কর্ণ যুদ্ধে মারা গেছে সুতরাং কুন্তীর আর কোন দায় ছিল না তাঁর কুমারী অবস্থার কলঙ্কের প্রসঙ্গ আলোচনা করার। কিন্তু কুন্তী তা জানালেন তাঁর পঞ্চসন্তানকে। যুদ্ধ শেষে গঙ্গায় তর্পনের সময় তিনি তাঁর পুত্রদের জানালেন– সৈন্যদলের মধ্যে যাকে দেখতে লাগত সূর্যের মতো, যার মতো বীর এই তিনভূবনে আর দ্বিতীয়টি নেই - সেই কর্ণ তোমাদের বড় ভাই। এই বিরাট যুদ্ধে সে অর্জুনের হাতে মারা গেছে, তার জন্য এক অঞ্জলি জল দিয়ে গঙ্গায় তর্পণ করিস তোরা। সে তোদেরই বড় ভাই, সূর্যের ঔরসে আমারই গর্ভে তার জন্ম হয়েছিল তোদেরও অনেক আগে।......কুরুধ্বমুদকং তস্য ভ্রাতুরক্লিষ্টকর্ম্মণঃ / স হি বঃ পূর্ব্বজো ভ্রাতা ভাস্করাম্ময্যজায়ত।[২৯] এই ক্ষণেই কুন্তী যেন মহীয়সী হয়ে উঠেছেন। নিজ গর্ভজাত প্রথম সন্তান যাকে অসহায়ভাবে কেবল পিতৃকূলের সম্মান রক্ষার্থেই জলে ভাসিয়ে দিতে হয়েছিল কঠোর কর্তব্যের দায়ে, আজ তার সমস্ত চিহ্ন যখন এই ভূবন থেকে নিচিহ্ন হয়ে গেল — তখন সেই সন্তানের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার সম্বন্ধে সকলকে অবগত করাটাও যেন কুন্তীর কর্তব্য বলেই মনে হল। এর ফলস্বরূপ নিশ্চিত অসম্মান ও লাঞ্ছনা যেন তাঁকে স্পর্শও করতে পারল না।

কেউ আপত্তি করে বলতে পারেন কুন্তী তাঁর নিজ সন্তানদের কাছে তাঁর জীবন বৃত্তান্তের গোপন সত্য প্রকাশ করেছেন মাত্র তাতে মহত্ত্বের কী বা আছে? অথবা এ থেকে কী করে বা দাবী করা যায় যে কর্ণকে সম্মাণিত করার জন্যই তাঁর এই গোপন সত্য প্রকাশ ? এর উত্তরে আশ্রমবাসিক পর্বের সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে কুন্তী পুনর্বার কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত পূঙ্খানুপুঙ্খরূপে ব্যাসদেবের কাছে

বিবৃত করেছেন। তিনি বলেছেন - 'যদি পাপমপাপং বা তদেতদ্বিবৃতং ময়া। তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি ভগবন্! ব্যপনেতুং ত্বমর্হাসি।।'[৩০]- অর্থাৎ ভগবন্! আমার এই কার্য্য দুষ্টই হোক্ বা অদুষ্টই হোক্, তা আমি প্রকাশ করলাম। সে যা হোক্, আমি সেই কর্ণকে দেখতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার সেই শোক দূর করুন।[৩১] ব্যাসদেব কুন্তীর ইচ্ছা পূরণ করেছেন। ব্যাসের তপঃসাধনে ভাগীরথী তীরে মৃত সমস্ত যোদ্ধাদের সাথে কর্ণও এসেছেন, যাকে দেখে পঞ্চপাণ্ডব আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাঁর দিকে ধেয়ে গেছেন।[৩২] পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়েছেন ক্রোধ ও অসূয়া শূণ্য হয়ে – এটা দেখার জন্যই কী কুন্তী আজীবন অপেক্ষা করে থাকেন নি? এতেই তাঁর জীবন তৃপ্ত হয়েছে, পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। কর্ণকে তাঁর প্রাপ্য জেষ্ঠ্য সন্তানের মর্যাদা ও সম্মান প্রদানের মাধ্যমেই কুন্তী তাঁর মাতৃত্বের পূর্ণতা অনুভব করেছেন। কুন্তীর মাতৃত্ব ধর্মই তাঁর সমস্ত ধর্মকে অতিক্রম করে তাঁকে মহীয়সী রূপে প্রতিষ্ঠা করে।

তথ্যসূত্র

১। রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত' শ্রী সুপ্রিয় সরকার, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স, প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা : ১৩৭৮, পৃঃ ২৯৬।
২। অতুলচন্দ্র সেন, 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা', কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র স্মারক সমিতি, কলিকাতা : ১৯৭১, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃঃ ৩৫।
৩। তদেব,
৪। তদেব, পৃঃ ৮৭
৫। E.G.Boring, H.S.Longfeld, H.P.weld, Foundations of Psychology, First Indian Ed., Bombay, Calcutta, New Delhi, Madras, Asia Publishing House, 1959, p. 523
৬। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১৯৯৮, পৃঃ ১৪।
৭। মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, 'মহাভারত', শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনুদিত, ব্রজকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা : ১৩৮৬ বঙ্গাব্দ, উদ্‌যোগপর্ব্ব (১৫), পৃ. ৮২৪
৮। Loc cit. ১৮
৯। Loc cit.
১০। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ১৯৯৮, পৃঃ ২১।
১১। তদেব
১২। তদেব
১৩। তদেব
১৪। তদেব
১৫। তদেব, পৃঃ ২৩
১৬। 'মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস, মহাভারত', শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনুদিত, ধীরা মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা : ১৩৪৫ বঙ্গাব্দ, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব (৪৩), পৃঃ ১৮০

১৭। Loc cit. পৃঃ ২৪
১৮। Loc cit. পৃঃ ১৮১
১৯। তদেব, পৃঃ ১৮২
২০। তদেব
২১। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা : ১৯৯৮, পৃঃ ৩৬।
২২। তদেব, পৃঃ ৪১।
২৩। 'মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, মহাভারত', শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত, আদিপর্ব্ব (৩) ব্রজাকিশোর মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা : ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৩৩২
২৪। তদেব, পৃঃ ১৩৩৩
২৫। তদেব, পৃঃ ৮১৯
২৬। রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত', শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা : ১৩৭৮, পৃঃ ৩১০-৩১১।
২৭। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, 'কৃষ্ণা কুন্তী এবং কৌন্তেয়', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ ৬৭।
২৮। Loc cit. পৃঃ ৩১৫
২৯। 'মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণবেদব্যাস, মহাভারত', শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত, স্ত্রী পর্ব্ব (৩১) ধীরা মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা : ১৩৯৮ বঙ্গাব্দ,পৃঃ ১৬৮-১৬৯।
৩০। তদেব, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব (৪৩), দ্বিতীয় সংস্করণ, কলিকাতা : ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৭৯-১৮৩।
৩১। রাজশেখর বসু, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত', শ্রীসুপ্রিয় সরকার, এম.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিঃ, কলিকাতা : ১৩৭৮, পৃঃ ৫৮৬।
৩২। 'মহর্ষি শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ণ বেদব্যাস, মহাভারত', শ্রীমদ্ হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্য্য অনূদিত, আশ্রমবাসিক পর্ব্ব (৪৩), ধীরা মণ্ডল, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, কলিকাতা : ১৪০০ বঙ্গাব্দ, পৃঃ ১৯৫।

মহাভারতের গান্ধারী : নারী তুমি মহীয়সী

সবিতা মণ্ডল

পুরাণে কথিত আছে —

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তী তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যা: স্মরেন্নিত্যং মহাপাতক-নাশনং।।"

অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী– এই পঞ্চনারী কোন গুণে স্মরণযোগ্য, যাঁদের স্মরণে পাপমুক্ত হওয়া যায় ; তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। শুধু এই টুকু বলার যে, গান্ধারী এই গৌরবে গৌরবান্বিতা নন। অন্তত: পুরাণ তাঁকে সেই মর্যাদা দেয় নি। পঞ্চপতিব্রতা (Women who remain loyal to her husband) রূপে সীতা, অরুন্ধতী পার্বতী, অনসূয়া ও সন্ধিলিনীর নাম উচ্চারিত হলেও গান্ধারী সেই মর্যাদা থেকেও বঞ্চিত। সতী (One who is embodiment of righteousness and all noble qualities) হিসাবেও তিনি খ্যাত নন। পঞ্চসতী সীতা, সাবিত্রী, চন্দ্রমতী, দোহুতী ও দময়ন্তীর সঙ্গে গান্ধারীর নাম উচ্চারিত হয় না। অথচ গান্ধারীর জীবন সাধনা ত্যাগ ও তিতিক্ষা, তাঁর ধর্মবোধ পর্যালোচনা করলে মহাকাব্যিক যুগের এক অসাধারণ মহিয়সী নারী বলে বিবেচিত হতে পারেন। কিন্তু গান্ধারী মহাভারতীয় দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছু নয়, সারা জীবনটাই তাঁর বঞ্চনার ইতিহাস।

মহাভারতের কুন্তী ও দ্রৌপদী, গান্ধারীর মতো একই রাজপরিবারের সদস্যা। সম্পর্কে কুন্তী তার জা, দ্রৌপদী পুত্রবধূ। কুমারী অবস্থাতেই কুন্তী সংবৎসর দুর্বাসা মুনিকে সেবায় তুষ্ট করে বর স্বরূপ এক মন্ত্র লাভ করেন, যার উচ্চারণপূর্বক স্মরণ করলে যে কোন দেবতা ও ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হতে পারেন। কিন্তু তাঁকে স্বামীত্বে বরণ করবার বর দেননি। অর্থাৎ এই মন্ত্র যে কোন নারীর ক্ষেত্রে অভিশাপ বলে গণ্য হওয়া উচিত। যদি সে নারীর মধ্যে সতী, পতিব্রতা হওয়ার স্বপ্ন থাকে। স্বামী গৌরবে গৌরবান্বিত হতে চায়। দুর্বাসার কাছে এই মন্ত্র লাভ করে সতীত্ব রক্ষার আশঙ্কায়, কিংবা পতিব্রতা হতে না পারার বেদনায় কুমারী কুন্তীর হা-হুতাশ দেখা যায় নি। বরং তিনি কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। নিতান্ত অবিবেচকের মতো তিনি সেই মন্ত্র উচ্চারণের দ্বারা সূর্যদেবকে স্মরণ করেন এবং তাঁর ঔরসে কুমারী কুন্তীর প্রথম

সন্তান কর্ণের জন্ম হয়। লোকলজ্জায় সেই সন্তানকে তিনি ত্যাগও করলেন। বিবাহের পর স্বামী পাণ্ডুর অক্ষমতায় তিনি পরপর ধর্ম, পবন ও ইন্দ্রকে স্মরণ করে তাঁদের ঔরসে যথাক্রমে যুধিষ্ঠীর, ভীম এবং অর্জুনকে পুত্র রূপে লাভ করলেন। ক্ষেত্রজ পুত্র লাভে নারীর সতীত্ব নিয়ে মহাভারতীয় যুগে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেনি। বংশ রক্ষায় কূলবধূকেও পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী হতে হত। এতে প্রয়োজন সিদ্ধ হতো নিশ্চয়ই, কিন্তু সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় নারীত্ব কি লাঞ্ছিত হত না ? অহল্যা স্বামীর ছন্দবেশী ইন্দ্রকে চিনতে পেরেও তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল, তারা বালীবধের পর বিবাহ করেছিল সুগ্রীবকে, মন্দোদরী রাবণের মৃত্যুর পর বিবাহ করেছিল বিভীষণকে। স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠতায় তারা কিংবা মন্দোদরী কেউই বৈধব্যজীবন মেনে নিতে পারেনি। আর দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর ভোগ্যা হয়েও কোন মহিমায় হয়ে উঠলেন পবিত্র। যাঁদের নাম স্মরণ করলে পাপমুক্তি ঘটে!

অথচ গান্ধারী তপস্যাবলে শিবের কাছে বরপ্রাপ্ত হলেন— গান্ধারী কিল পুত্রাণাং শতং লেভে বরং শুভা।- তিনি শতপুত্রের জননী হবেন। মনের মতো যোগ্য, সুপুরুষ স্বামীলাভের আশায় কুমারীকন্যা আন্তরিক নিবেদনে শিবপূজা করেন। গান্ধারীর সে তপস্যা সফল হল স্বয়ং শিবের পরপ্রাপ্তির মধ্য দিয়ে। আর অসামান্য সুন্দরী রাজকন্যা গান্ধারীর বিবাহের সম্বন্ধ এল কিনা ভারত বিখ্যাত কুরুবংশের সন্তান অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে। সে রাজা নয়, রাজা হওয়ার সামর্থ্যও নেই তার। বিচিত্রবীর্যের দুই পুত্র ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু। বয়সে ধৃতরাষ্ট্র বড় হলেও অন্ধ, রাজকার্যে অক্ষম। তাই পাণ্ডুই কুরুবংশের রাজা হবে। রাজকন্যা যে, সে-তো রাজরাণী হওয়ার স্বপ্নেই বড় হয়। কিন্তু গান্ধারী যখন দেখলেন তাঁর বাবা-মা তাকে অন্ধস্বামীর হাতেই সমর্পণ করতে চাইছেন তখন তিনি নিজেই পট্টবস্ত্রের দ্বারা চোখ আবৃত করে স্বামীর অন্ধত্ব কে বরণ করে নিলেন। এই প্রতীকী ঘটনায় বাবা মার প্রতি যে অভিমানই থাক, এর মধ্যে কতখানি স্বামীর প্রতি আনুগত্য আছে সেই আলোচনায় প্রবেশ করবার পূর্বে আরেকটি প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই।

পুরাণে পঞ্চপতিব্রতার নাম নির্দিষ্ট আছে। সীতা, অরুন্ধতী, পার্বতী, অনসূয়া ও সন্ধিনিনী। সীতা রামের সহধর্মিনী সন্দেহ নেই। সহধর্মিনী রূপে তিনি চৌদ্দ বছর রামের সঙ্গে বনবাসী হয়েছিলেন। এই পতিব্রতা নারীকেও তার স্বামীর কাছে অবিশ্বাসী হতে হয়েছিল। তিনি হতভাগিনী সন্দেহ নেই। কিন্তু গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্মিনী ছিলেন। তিনি স্বামীর ছায়ার মতো জীবন কাটিয়েছেন। স্বামীর কাছে তিনি কখন সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেননি।

অরুন্ধতী বশিষ্ঠের পত্নী ও অতীব বিদুষী ছিলেন। তাঁর পাতিব্রত্য ও পতিভক্তির আদর্শ সমস্ত নারীর অনুশীলন যোগ্য। মহাভারতের অনুশাসন পর্বে উল্লিখিত হয়েছে, যে নারী পাতিব্রত্যের ধর্মপথ অনুসরণ করেন তিনি অরুন্ধতীর মতো স্বর্গেও পূজিতা হন। নক্ষত্রলোকে সপ্তর্ষিমণ্ডলে বশিষ্টের পাশে অরুন্ধতীও বিরাজ করেন। বিবাহের মন্ত্র উচ্চারণের সময় নববধূকে অরুন্ধতী নক্ষত্র দেখানো হয়, যাতে সেই বধূ অরুন্ধতীর

আদর্শের অনুগামিনী হন। সুতরাং অরুন্ধতীর পাতিব্রত্য ও পতিভক্তি নিয়ে কোন সংশয় নেই। তিনি নিঃসন্দেহে পঞ্চপতিব্রতার অন্যতমা।

পার্বতী হিমালয় ও মেনকার কন্যা। মহাদেবের পত্নী। পূর্বজন্মে তিনি দক্ষরাজের কন্যা সতী রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। দক্ষযজ্ঞে আমন্ত্রিত না হওয়ায় অপমানিত সতী স্বামীর নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করে পিতৃগৃহে গমন করেন। কিন্তু যেখানে পিতৃমুখে পতিনিন্দা সহ্য করতে না পেরে দেহত্যাগ করেন। পরজন্মে পার্বতী রূপে গভীর তপস্যার মধ্য দিয়ে মহাদেবকে তুষ্ট করে তাঁকে পতিত্বে বরণ করেন। পার্বতী পাতিব্রত্যের নিষ্ঠা ও তপস্যার অপর নাম।

কুমারী অনসূয়া কণ্বমুনির আশ্রমে শকুন্তলার সহচরী ছিলেন। সার্থক নামা অনসূয়া অত্রি মুনিকে পতিত্বে বরণ করেন। একদা ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশ্বর অনসূয়ার সতীত্ব পরীক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ বেশে অনসূয়ার কুটীরে উপস্থিত হন। এবং পুত্ররূপে আতিথ্য গ্রহণের মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেন। তখন অনসূয়া স্বামীর পাদোদক অতিথিত্রয়ের গায়ে ছিটিয়ে বলেন - 'বালো ভব'। তখন বাৎসল্য হেতু তার স্তন দুগ্ধে পূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই স্তন্য পান করিয়ে তিন ব্রাহ্মণ বেশী দেবতাকে তৃপ্ত করেন। পরম পরিতৃপ্ত হয়ে ব্রাহ্মণরূপী ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর স্বমূর্তি ধারণ করে অনসূয়াকে বর দিতে চাইলে তাঁদের তিনি পুত্র রূপে কামনা করেন। ফলে ব্রহ্মার অংশে সোম, বিষ্ণুর অংশে দত্তাত্রেয় এবং মহেশ্বরের অংশে দুর্বাশা মুনির জন্ম হয়। তিনি তিনপুত্রের জননী হন। সর্বাদা তিনি স্বামীর অনুগামিনী রূপে পরহিতার্থে জীবন কাটান।

এই পঞ্চনারীর পাতিব্রত্য নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। পাশাপাশি গান্ধারীর পাতিব্রত্য প্রতীকী ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের সঙ্গে বিবাহপ্রস্তাব গান্ধাররাজ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পরই গান্ধারী ভাবী স্বামীর অন্ধত্বকে বরণ করে নেন। তাঁর স্বামী যখন কোনদিনই তাঁকে দেখতে পাবেন না, তখন তিনিও দেখবেন না স্বামীকে। গান্ধারী সেই নারী যিনি পতির ব্রত তথা জীবনসাধনাকে নিজের জীবনসাধনায় রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কতখানি মানসিক শক্তি থাকলে পাতিব্রত্যের জন্য এই নিদর্শন তুলে ধরা যায়!

সতীত্বের প্রশ্নেও পঞ্চসতীর তালিকায় তাঁর নাম নেই। পুরাণে উল্লিখিত পঞ্চসতী—সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, চন্দ্রমতী ও দেবাহুতি। সতীত্বের প্রশ্নে সীতাকে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হয়েছে। সীতা চরিত্রের বিশুদ্ধতা নিয়ে প্রজাদের সন্দেহের কারণে রামচন্দ্র সীতাকে বিসর্জনও করেছিলেন। অশ্বমেধযজ্ঞ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে সীতাকে পুনরায় গ্রহণের ব্যাপারেও সতীত্বের পরীক্ষা দিতে হয়। সতীত্বের প্রশ্নে নারীত্বের অবমাননায় সীতা পাতাল প্রবেশ করেন। রামচন্দ্র সীতার সতীত্বের প্রশ্নে সন্দিহান ছিলেন, এমন নয়; কিন্তু স্বামীসত্তার উর্ধ্বে তিনি রাজসত্তাকে ঠাঁই দিয়েছিলেন।

সন্তান কামনায় মন্ত্ররাজ অশ্বপতি সূর্যাধিষ্ঠাত্রী সাবিত্রী দেবীর তপস্যা করে এক তেজস্বী কন্যা লাভ করেন। দেবীর আশীর্বাদধন্যা বলে তাঁর নাম রাখেন সাবিত্রী। এই কন্যা স্বল্পায়ু জেনেও মনোনীত সত্যবানকেই স্বামী হিসাবে বরণ করেন।

সত্যবাণের মৃত্যুর পর সাবিত্রী তার তপশ্চর্যা ও ব্রত উপবাসের দ্বারা যমরাজকে সত্যবানের আত্ম পাশবদ্ধ করে দক্ষিণ মুখে যাত্রা করলে সাবিত্রী যমরাজের পশ্চানুধাবণ করেন। তাকে মিষ্ট ভাষণে নিবৃত করতে ব্যর্থ হয়ে যমরাজ সাবিত্রীকে চারদফা বর দান করেন –

১ম বরে সাবিত্রী অন্ধ শ্বশুরের চক্ষুলাভ ও তেজ লাভ প্রার্থনা করেন।

২য় বরে সাবিত্রী শ্বশুরের হৃত রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রার্থনা করেন।

৩য় বরে সাবিত্রী পিতার শত পুত্র লাভের কামনা করেন।

৪র্থ বরে সাবিত্রী শতপুত্রের জননী হওয়ার বর প্রার্থনা করেন।

যমরাজ তা মঞ্জুর করলে যমরাজকে প্রদত্ত বরের ফাঁদে ফেলে স্বামীর পুনর্জীবন লাভ কামনা করলেন। কেননা, স্বামী বিহনে তার জননীত্ব লাভ কি করে সম্ভব। আর তা না হলে তো যমরাজের বর ব্যর্থ হবে। সুতরাং যমরাজ এক প্রকার বাধ্য হয়েই সাবিত্রীর বুদ্ধিমত্তার কাছে হেরে গিয়ে সত্যবানের পুনর্জীবন দান করলেন।

মহাভারতের বনপর্বের এই কাহিনিতে সাবিত্রী বনবীর্যসম্পন্ন পুত্র লাভের বর প্রার্থনা করেছিলেন। গান্ধারীও মহাদেবের বরে শতপুত্রের জননী হন - কিন্তু তিনি সাবিত্রীর মতো বলবীর্যসম্পন্ন পুত্রের কথা বলেন নি বলেই কি শতপুত্রের জননী হয়েও পুত্রহীনা হতে হলো তাকে! তপশ্চর্যায় যিনি তুষ্ট হয়ে বর দিচ্ছেন, তিনি কি অহংকারী দুশ্চরিত্র সন্তান লাভের বর দিতে পারেন ? সে আবার এমন পুত্র যে জন্মলাভের সময় গাধার ডাকের মতো কেঁদে উঠেছিল। সেই ডাক শুনে গাধারাও ডেকে উঠেছিল – শেয়াল, শকুন কাকও। এতে অমঙ্গল আশঙ্কায় শঙ্কিত হয়ে বিদুর প্রমুখ অমাত্যগণ ধৃতরাষ্ট্রকে সদ্যজাত পুত্র দুর্যোধনকে ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। দেবতার বরে প্রাপ্ত মাতৃত্বের কি অসাধারণ পরিহাস? অথচ এই গান্ধারী মাতৃত্বলাভের অসীম পিপাসায় মহাদেবের নিকট প্রাপ্ত বরকে ব্যাসদেবের বরে নিশিত করে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কোন বর তিনি প্রার্থনা করেন নি। মাতৃত্বকে কত বড় স্থান দিলে একই বর দু'বার কামনা করে মানুষ! কিন্তু কি তার পরিণাম ? সন্তান জন্মাবার পরই তাঁকে বিসর্জনের আবেদন। হায় রে জননী!

কুন্তী অবলীলায় তাঁর কানীন পুত্রকে বিসর্জন দিতে পেরেছিলেন, নিজের সন্তানের জন্য, আত্মমর্যাদার জন্য, কিন্তু গান্ধারী পারলেন না। পারলেন না দুটি কারণে —

এক - জননীত্বের তীব্র বাসনায় তিনি দু-দুবার একই বর প্রার্থনা করেছেন। সেই স্বপ্নপূরণে বাৎসল্যের যে উৎসার ঘটে, তাতে প্রথম সন্তান বিসর্জন দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

দুই - গান্ধারী যে কঠোর জীবন সাধনায় পাতিব্রত্যকে বরণ করে নিয়েছেন, তাতে স্বামীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সন্তান বিসর্জন দেওয়ার কথা গান্ধারীর পক্ষে ভাবা সম্ভব নয়। বরং গান্ধারী পাতিব্রত্যের চরম সাধনায় স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছায় রূপ দিতে চেয়েছিলেন। অন্ধ হওয়ার কারণে রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়ার জন্য ধৃতরাষ্ট্র গান্ধারীর কাছে বার বার পরিতাপ জানিয়েছেন।

দাদার এই অন্তরবেদনার কথা ভাই পাণ্ডুও কি আঁচ করতে পেরেছিলেন, তাই কি দাদার হাতে রাজ্য ভার তুলে দিয়ে তিনি দুই পত্নীকে নিয়ে বনবাসী হয়েছিলেন? বনবাসী হওয়ার ঘটনা সত্য হলেও এর নেপথ্য কারণ মহাভারতে উল্লিখিত হয়নি। পাণ্ডু ধৃতরাষ্ট্রের কোনো প্ররোচনা বা চক্রান্তের স্বীকার কিনা তাও জানা যায় না। কেননা রাজ্যভার গ্রহণ করেও ধৃতরাষ্ট্র স্বস্ত্রীক পাণ্ডুকে রাজধানীতে ফিরিয়ে আনার কোন উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়াস পান নি। এমনকি দূত পাঠিয়ে তার খোঁজ খবর নেওয়ারও চেষ্টা করেন নি। যা প্রমাণ করে রাজতক্ত তিনি উপভোগ করেছেন। এবং উত্তরসুরির হাতে নিশ্চিতভাবে রাজত্বভার তুলে দেওয়ার স্বপ্নে মশগুল আছেন।

কারণ, গান্ধারী কুন্তীর আগে গর্ভধারণ করেছিলেন। সেই হিসাবে গান্ধারী কুন্তীর আগেই সন্তানের জন্ম দেবে। আর তার সন্তানই হবে সিংহাসনের অধিকারী। কিন্তু কী দুর্দৈব! পরে গর্ভধারণ করেও কুন্তী অরণ্য আবাসে পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। আর গান্ধারী তখনও জননী হতে পারেন নি। গর্ভধারণের বৎসরকাল অতিক্রান্ত হলেও গর্ভমুক্তির কোন সম্ভাবনাই দেখা গেল না।

ধৃতরাষ্ট্রের বড় স্বপ্ন ছিল, জ্যেষ্ঠ হয়েও অন্ধত্বের কারণে তিনি রাজা হতে পারেননি, তার সন্তান যদি জ্যেষ্ঠ হয়ে জন্মায় তবে পাণ্ডুর পরই তার পুত্র রাজ্যাধিকার লাভ করবে। কিন্তু গান্ধারীর গর্ভমুক্তির আগেই কুন্তী পুত্র সন্তান প্রসব করার সেই স্বপ্ন খান খান হয়ে ভেঙে গেছে। ধৃতরাষ্ট্রের এই স্বপ্ন-সাধ, বঞ্চনার বেদনা গান্ধারীর সত্তার গভীরে সঞ্চারিত হয়। সেই জন্যই বোধকরি কুন্তীর প্রতি ঈর্ষায় অসম্মানে-অপমানে গান্ধারী নিজেই নিজের গর্ভে আঘাত করেন। সেই আঘাতেই একটি মাংসপিন্ড প্রসব করেন তিনি। ধ্যানযোগে এ কথা জানতে পেরে স্বয়ং ব্যাসদেব এসে জানতে চাইলেন - এ কী করলে গান্ধারী - 'স চাত্মানো মতং সত্যং শশংস পরমর্ষয়ে।' গান্দারী কিছুই গোপন করলেন না। বললেন- 'জ্যেষ্ঠং কুন্তীসুত জাতং শ্রুত্বা রবিসমপ্রভম্।'- এই স্বীকারোক্তিতে প্রকাশ (রবির) মতো দ্যুতিময় কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরই তো এই বংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র; উত্তরাধিকার সূত্রে সেই এ বংশের রাজা হবে। সেই দু:খে-অভিমানে গান্ধারী স্বগর্ভে আঘাত হেনেছিলেন। গান্ধারীর এই বাসনা ধৃতরাষ্ট্রের দ্বারা সংক্রামিত সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা তার মনের কথা হলেও আপত্তি করার কিছু নেই।

রাজকন্যা গান্ধারী শিবের কাছে, পরে ব্যাসদেবের কাছে শতপুত্রের জননী হওযার বর প্রার্থনা করেন। রাজবধূ হিসাবে তিনি তো চাইতেই পারেন, রাজমাতা হতে। সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হলে ঈর্ষা অভিমান তো হতেই পারে। কিন্তু বর চাওয়ার সময় গান্ধারী কুলজ্যেষ্ঠ পুত্রের কামনা তো করেননি। ব্যাসদেব কিংবা মহাদেব শতপুত্রের বর দান করলেও কুলজ্যেষ্ঠ পুত্রের কোন প্রতিশ্রুতি তাতে ছিল না। কাজেই ব্যাসদেবের সৌজন্যে শতপুত্রের জননী হলেও কুলজ্যেষ্ঠ পুত্রের জননী হতে তিনি পারলেন না। গান্ধারীর প্রথম পুত্র দুর্যোধনের জন্মের পরই ব্যাসদেব ভীষ্ম-বিদুর প্রমুখ কুরুকুলদের জানিয়ে দেন – 'জন্মতস্ত প্রমাণেন জ্যেষ্ঠো রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।'- জন্মের ক্রম অনুযায়ী কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরই কুরুকুলের রাজা হবেন।

গর্ভধারণের পর গান্ধারীর মনে হয়েছিল-শতপুত্রের সঙ্গে একটি কন্যা জন্মালে বেশ হয়। 'মমেয়ং পরমা তুষ্টির্দুহিতা মে ভবেৎ যদি।' এই কন্যার প্রার্থনা গান্ধারী বরপ্রাপ্তির সময় করেননি। যেমন করেননি কুলজ্যেষ্ঠ পুত্রের কামনা। ব্যাসদেব কিন্তু গান্ধারীর কন্যা বাসনা-কে পূর্ণ করেছিলেন। দুঃশলা নামে এক কন্যার জননী হতে পেরেছিলেন গান্ধারী। কিন্তু গর্ভধারণের পর কুলজ্যেষ্ঠ পুত্রের যে বাসনা গান্ধারীকে পেয়ে বসেছিল, তা তিনি পূরণ করেননি। পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে গান্ধারী পরিপূর্ণ জননীত্বের আস্বাদ পেলেন, কিন্তু রাজমাতার গৌরব অর্জন করতে পারলেন না।

ধৃতরাষ্ট্র কোনদিনই তাঁর অদৃষ্টকে মেনে নেননি। অন্ধ হওয়ার কারণে রাজ্যের উত্তরাধিকার না পেলেও কোন অজ্ঞাতকারণে রাজা পাণ্ডু সস্ত্রীক বনবাসী হন এবং ধৃতরাষ্ট্র কার্যনির্বাহী রাজা হিসাবে কুরুরাষ্ট্র শাসন করেন। পুত্র দুর্যোধন কুলজ্যেষ্ঠ না হওয়ার কারণে রাজ্যের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হলেও ধৃতরাষ্ট্র দুর্যোধনের জন্মগ্রহণের পরই সভা ডেকে ভীষ্ম-বিদুর প্রমুখ কুরুকুল প্রধানদের কাছে জানতে চান – যুধিষ্ঠিরের পর দুর্যোধন রাজ্যের উত্তরাধিকার পাবে তো ? এই প্রশ্নের মধ্যেই অশনি সংকেত লুকিয়ে আছে। কার্যনির্বাহী রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুত্রের রাজ্যাধিকার সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চান। এই নিশ্চয়তা যদি আদায় করা যায়, তবে বালক যুধিষ্ঠিরকে রাজার পক্ষে জীবন থেকে সরিয়ে দিতে কতক্ষণ? 'ধৃতরাষ্ট্রের এ' প্রস্তাবে কুরুকুলপতিদের মধ্যে যুধিষ্ঠিরের প্রাণ সংশয়ের আশঙ্কা জন্মায়। এই সভার আহ্বানে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে প্ররোচিত করেননি ঠিকই, কিন্তু পুত্রের রাজ্যাধিকার নিশ্চিত করতে ধৃতরাষ্ট্রের এই অন্যায় প্রয়াসে বাধাও দেননি। পতিব্রতা রূপে স্বামীর অন্যায় আবদারও কি মেনে নিচ্ছেন গান্ধারী ? নাকি, এই প্রয়াসে তারও সমর্থন আছে ?

সভায় উপস্থিত ব্রাহ্মণ্য মণ্ডলী ও সর্বোপরি বিদুর দুর্যোধনের রাজ্যাধিকারের নিশ্চয়তা তো দূরের কথা তাঁরা দুর্যোধনকে চিরতরে ত্যাগের পরামর্শ দিলেন। কারণ দুর্যোধন অমঙ্গলের প্রতীক। কারণ জন্মগ্রহণের সময় তাঁর কান্নার শব্দ ছিল গাধার ডাকের মতো। তা শুনে নাকি অন্য গাধারাও ডেকে উঠেছিল। তার সঙ্গে সঙ্গত দিয়েছিল শেয়াল-শকুন-কাক-যারা অমঙ্গলের ইঙ্গিত বহন করে। ধৃতরাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলেও অমাত্যদের কথায় তিনি পুত্রত্যাগ করতে পারেননি।- 'ন চকার তথা রাজা পুত্রস্নেহসমন্বিত:।' গান্ধারীও পুত্র ত্যাগের কথা ভাবতে পারলেন না। অন্ধপুত্রস্নেহ কি এর নেপথ্য শক্তি। নাকি, গান্ধারী ঔচিত্য ও পাতিব্রত্যের সংকটে দোদুল্যমান। পাতিব্রত্যের সঙ্গে জননীত্ব যুক্ত হয়ে গান্ধারীর ঔচিত্যবোধকে আচ্ছন্ন করেছে। পরবর্তী কালে আমরা দেখবো, তিনি ঔচিত্যেও তথা ধর্মবোধের উপরে দাঁড়িয়ে বারবার দুর্যোধনকে তার দুষ্কর্ম সম্পর্কে সচেতন করে দিচ্ছেন, এমনকি, পুত্রত্যাগের কথাও বলছেন বার বার - ততদিনে শিশু বিষবৃক্ষ ডালপালা বিস্তার করে মহীরুহ হয়ে উঠেছে। যা তিনি একদিন সহজেই করতে পারতেন তা কালে কালে ইচ্ছা ও কর্মপ্রয়াসের অতীত হয়ে উঠেছে। কুন্তী একদিন শুধু আত্মসম্মানের জন্য কর্ণকে অনিশ্চয়তার পথে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধারী কুলাঙ্গার পুত্রের

জননী হওয়ায় অসম্মানের হাত থেকে আত্মরক্ষা ও কুল রক্ষা করতে দুর্যোধনকে ত্যাগ করতে পারলেন না। গান্ধারীর ধর্মবোধ ক্রমাগত পুত্রের দুষ্কর্মের কাছে পীড়িত হয়েছে, স্বামীর অন্যায় আনুগত্যের কাছেও। স্বামী-পুত্রের পীড়নের ভেতর থেকে পাতিব্রত্য ও জননীত্বের উর্ধ্বে নারীত্বের দীপ্তি নিয়ে গান্ধারী জেগে উঠেছে।

রাজনীতির অঙ্গনে গান্ধারী কোনদিনই সক্রিয় ভূমিকা পালন করেননি। পুত্রের ছল চাতুরী পাণ্ডবদের প্রতি ঈর্ষা, ভ্রাতা শকুনির চক্রান্ত, স্বামী ধৃতরাষ্ট্রের ইন্ধন কোন কিছু নিয়েই তিনি চর্চা করেননি। রাজ-অন্তঃপুরে সমস্ত ঘটনা খবর হয়ে নিশ্চয়ই প্রবেশ করত, সে সম্পর্কে গান্ধারীর ওয়াকিবহাল থাকাই স্বাভাবিক। তা সত্ত্বেও কোন ইতিবাচক ভূমিকায় তাঁকে দেখা যায় না। কিন্তু সমস্তই তাকে পীড়িত করে। এই পীড়নের মাত্রা সহ্যের সীমা প্রথম অতিক্রম করে প্রকাশ্য রাজসভায় কুরুকুলপতিদের সামনে কুলবধূ দ্রৌপদীর লাঞ্ছনা। সেই প্রথম গান্ধারী সবিদুর ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গভীর আর্তি জানালেন –

'ততো গান্ধারী বিদুরশ্চৈব বিদ্বান
নিবেদয়ামাসতু-রার্তবত্তদা।'

গান্ধারীর এই বিরোধিতায় একেবারে বিপরীত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধৃতরাষ্ট্র হকচকিয়ে যান এবং দুর্যোধনকে কঠিন তিরস্কার করে পাণ্ডবদের রাজ্যপাট এবং দ্রৌপদীসহ সমস্ত ধনসম্পত্তি ফিরিয়ে দেন। কিন্তু পরক্ষণেই পুনরায় শকুনি ও দুর্যোধনের পাশা খেলার পরিকল্পনাকে অনুমোদন দিয়ে ধৃতরাষ্ট্র কুরুকুলের বিপর্যয়কে অনিবার্য করে তুলেছেন। গান্ধারী স্বামীকে পুত্র ত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন- 'তস্মাদয়ং মদ্বচনাত্ ত্যাজ্যতাং কুলপাংসনঃ'। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্র সে-কথা কানে তোলেননি। বরং নিয়তির দোহাই দিয়ে দুর্যোধনের বাসনাকেই শিলমোহর দিয়েছেন।

সেই নিয়তিকে স্বীকার করেই কি গান্ধারী পাশাখেলায় হেরে গিয়ে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসে গমনকালে কুন্তীর আর্ত হাহাকার প্রশমনের কোন প্রয়াস পাননি। তিনি তো মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন তার স্বামী-ভাই-পুত্র মিলে গভীর চক্রান্তে পাণ্ডবদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছেন। কোন মুখে তিনি কুন্তীর সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন। কিংবা গভীরতর ঈর্ষা তখনও হয়ত সক্রিয় ছিল গান্ধারীর মনে— কুন্তী যদি গান্ধারীর আগে পুত্র সন্তানের জন্ম না দিতেন? তাহলে এ সবের কিছুই হয়ত ঘটতো না।

গান্ধারীর জীবন কি ক্রমশ পুতুল জীবন হয়ে যাচ্ছে। কোন ঘটনারই তিনি নিয়ন্ত্রক নন, কেবলই এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে চলেছেন। পিতার বিরুদ্ধাচরণ না করতে পেরে গান্ধারী একদা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে স্বামীত্বে বরণ করে নিলেন। পতিব্রতা হতে গিয়ে অন্ধত্বকে বরণ করলেন। সেই পতিকে বশ করতে পারেননি। পতির বশবর্তী হয়ে পিতা-পুত্র-ভ্রাতার অন্যায় অধর্মকে নীরবে সহ্য করেছেন আর রক্তাক্ত হয়েছেন। দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় গান্ধারী তীব্র প্রতিবাদী হয়ে উঠলেও তা স্থায়ী ফলদান করেনি। পুনরায় পাশাখেলার জন্য ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডবদের ডেকে পাঠালে গান্ধারীর কোন প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা যায় নি। নিয়তির পরিহাস হিসাবে সবই তিনি মেনে নিয়েছেন। মাঝখান

থেকে স্বামীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে পতিব্রতার আদর্শে কালিমা লিপ্ত করলেন।

গান্ধারী নিজের স্বামীর দ্বিচারিতায় পুত্রের রাজ্য লোভে দ্বিধায় পড়েছেন। তাঁর অন্তরগত ধর্মবোধ পীড়িত হয়েছে। যুদ্ধের অনিবার্য ফলশ্রুতি সম্পর্কে অনেক বুঝিয়েছেন। ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি মনের দিক থেকে পিতাপুত্রের সঙ্গ ত্যাগ করে ন্যায় ধর্মে স্থিত হয়েছেন। প্রতিদিন যুদ্ধযাত্রাকালে দুর্যোধন মায়ের কাছে যুদ্ধজয়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলে গান্ধারী বলেছেন – 'উক্তবত্যসি কল্যাণি মতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।' যে পক্ষে ধর্ম আছে, সেই পক্ষেরই জয় হবে। পুত্রের জয়ৈষণাকে তৃপ্ত করতে গিয়ে তিনি ন্যায়ধর্ম থেকে বিচ্যুত হননি।

অথচ দুর্যোধনসহ শতপুত্রের মৃত্যুতে মাতৃস্নেহের প্রাবল্যে গভীর শোকাহত গান্ধারী আপন ধর্মবৃত্তের বাইরে পুত্রহন্তারক পাণ্ডবদের প্রতি প্রবল ক্রোধান্বিত হয়ে উঠেছেন–তখন স্বয়ং ব্যাস তাঁর পুত্রবধূর চিত্তে ধর্মবোধ জাগ্রত করে তাকে ধর্ম বৃত্তে ফিরিয়ে আনার প্রয়াস পান। যুধিষ্ঠির সমস্ত দায় স্বীকার করে গান্ধারীর কাছে অবনত হয়ে শাস্তি প্রার্থনা করেন। স্বয়ং কৃষ্ণ গান্ধারীর ক্রোধ প্রশমনে সচেষ্ট হন। অবশেষে পাণ্ডবদের প্রতি ক্রোধ প্রশমিত হলে পুত্রহীনা দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছেন – আমাকে দেখো – 'মৈবং পুত্রীতি দুঃখার্তা পশ্য মামপি দুঃখিতাম্।' —আমিতো তোমার মতো পুত্রহীনা। সমস্ত দোষ গান্ধারী নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে বলেছেন – 'মমৈব হ্যপরাধেন কুলমগ্র্যং বিনাশিতম্।'- আমারই দোষে কুরু বংশ ধ্বংস হয়ে গেল।

গান্ধারীর এই অন্তিম অনুশোচনার মধ্যে দীর্ঘদর্শিনী সত্তার উন্মোচন আছে। গান্ধারীর নিষ্ক্রিয়তা ও উদাসীনতায় বিষবৃক্ষ স্বরূপ দুর্যোধন বিকশিত হয়েছে। জননীর ভূমিকা তিনি যথাযথ পালন করেননি। দুর্যোধন কুপুত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু গান্ধারীকে 'কুমাতা' যদি নাও-বা বলি, তবু আদর্শ জননীর সন্তানের প্রতি যে দায়বদ্ধতা থাকে, তা তিনি যথাযথ পালন করেননি। সন্তানের মানসগঠন ও চরিত্রগঠনে গান্ধারীর কোন ভূমিকা নেই। এই কুরুক্ষেত্রের অনিবার্য পরিণাম প্রত্যক্ষ করে দীর্ঘদর্শিনী গান্ধারী নিজেকেই দায়ী করেছেন।

গান্ধারী মহাদেব ও ব্যাসদেবের বর পেয়ে শতপুত্রের জননী হয়েও সার্থক মা হতে পারলেন না। পারলেন না পতিব্রতা নারীর মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে। অথচ স্বামীর বাসনা ও লালসাকে আপন সত্তায় লালন করে ন্যায়ধর্ম থেকেও বিচ্যুত হলেন। পুণ্যবতী কিংবা সতীদের গৌরব কিছুই জুটলো না তাঁর কপালে। বিপুল সম্ভাবনা নিয়েও গান্ধারীর মহীয়সী নারী হওয়া হল না, ঈর্ষা, অন্ধ বাৎসল্য, স্বামীর সঞ্চারিত লালসায় গান্ধারী হয়ে উঠলেন একেবারে রক্তমাংসে গড়া সাধারণ নারী। তাঁর ত্যাগ-তিতিক্ষা ধর্মবোধের পলেস্তারা দিয়ে (sugar-coating) এই সাধারণ নারীকে অসাধারণ করে তোলার মহাকাব্যিক প্রয়াস poetic justice ছাড়া আর কি।

'কিরাতার্জুনীয়ম্' মহাকাব্যের আলোকে দ্রৌপদী

অরুনিমা ঘোষ

অধ্যাপিকা (অংশকালীন), কোলকাতা টিচার্স-ট্রেনিং কলেজ

বিশ্বজগৎ তথা মানবজাতির উৎপত্তির ইতিহাস প্রসঙ্গে বৃহদারণ্য কোপনিষদে বলা হয়েছে যে, জগৎ সৃষ্টির পিছনে এক রিবাটপুরুষের অস্তিত্ব রয়েছে। এই বিরাট পুরুষের আপন ইচ্ছা থেকেই নারীসত্তার উৎপত্তি 'আত্মবেদমগ্র আসীদেক এব সোহকাময়ত জায়া মে স্যাৎ'- এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে সৃষ্টির পূর্বে আত্মাই একমাত্র সত্তা ছিলেন, যিনি পত্নী কামনা করেছিলেন। এই ঔপনিষদিক বাণীই নারীজাতির উৎপত্তির মহিমা তুলে ধরেছে। এই উৎপত্তির মহিমা থেকেই নারীজাতির ধীরে ধীরে যুগান্তকারী পদমর্যাদা বৃদ্ধি ঘটেছে। প্রাচীন ইতিহাসাদি অবলোকন করলে দেখা যায় নারী চরিত্র কখনও দেবীরূপে পূজিতা, আবার কখনও ক্ষাত্রধর্মের সচল প্রতিমা, আবার কখনও বা রাজনৈতিক বাতাবরণে লালিতা পালিতা হয়ে উচ্চরাজনীতিজ্ঞানসম্পন্না। এমনই এক মহীয়সী নারী হলেন মহাকবি ভারবি প্রণীত 'কিরাতাজুনীয়ম্' মহাকাব্যে উল্লিখিত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের অযোনিসম্ভূতা কন্যা 'দ্রৌপদী'।

'কিরাতাজুনীয়ম্' মহাকাব্যে দ্রৌপদীকে প্রথমে উপস্থিত করা হয়েছে অসহমানা মুখরা রমণী হিসাবে, বনেচরের মুখে শোনা দুর্যোধনের রাজ্যশাসন বৃত্তান্তগুলি যুধিষ্ঠির দ্রৌপদী ও ভাইদের জানালেন। যে কথাগুলি বলামাত্র দ্রৌপদী নানা ক্রোধোদ্দীপক বাক্যবাণে যুধিষ্ঠিরকে বিদ্ধ করলেন। আপাতদৃষ্টিতে বিচার করলে দ্রৌপদীকে কোপনস্বভাবা, প্রতিহিংসাপরায়ণারমণী বলে মনে হলেও তাঁর প্রতিটি উক্তির মার্মার্থ বিচার করলে দেখা যাবে-তিনি যথার্থ মহীয়সী বীরাঙ্গনা ভারতরমণী।

দ্রৌপদী যেমন তেজস্বিতার প্রতিমূর্তি, তেমনি আবার ভারতীয় নারীজনোচিত শিষ্টাচার, নম্রতা, পাতিব্রত্যেরও ছিলেন বিগ্রহ রূপা। তিনি স্বয়ং রাজদুহিতা হয়েও বিপদগ্রস্ত পঞ্চপতির অনুগমন থেকে কখনও বিমুখী থাকেননি। দীর্ঘ বারো বছর যাবৎ পতিদের অনুগামিনী হয়ে বনবাসের কষ্ট স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তিনি পাতিব্রত্যের বিচারে সীতা, সাবিত্রীর সমকক্ষতা লাভ করেছেন। তিনি আবার যুধিষ্ঠিরের শান্তিপ্রিয়তায় অধীরা হয়েও সর্বতোভাবে শিষ্টাচার লঙ্ঘন করেননি। যুধিষ্ঠিরের প্রতি উক্তি করবার পূর্বে ভূমিকারূপে দ্রৌপদী বলেন যে, যুধিষ্ঠিরের মত প্রাজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তির প্রতি নারীজনোচিত উপদেশ নিতান্তই তিরস্কারস্বরূপ। তথাপি অসহ্য মনোবেদনা স্ত্রীজনোচিত শালীনতা ও সদাচার লঙ্ঘন করে তাঁকে বলতে বাধ্য করছে।

কালিদাসের 'শকুন্তলা' ঃ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে মহীয়সী নারীচরিত্র

মধুরিমা মুখার্জী
গবেষক, মগধ বিশ্ববিদ্যালয়

সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মহাকবি কালিদাস বিরচিত সর্বোৎকৃষ্ট নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্'। এই নাটকের নায়িকা শকুন্তলা আজন্ম মহর্ষি কণ্বের আশ্রমে পরম স্নেহে প্রতিপালিতা, তপোবনের মৃগশাবকদের সাথে সংবর্ধিতা, সরলা, প্রাঞ্জল হৃদয়া। কুলপতি কণ্বের পালিতা কন্যা শকুন্তলা। উর্বশী মেনকা তার মাতা এবং ঋষি বিশ্বামিত্র তার পিতা। বিধাতার এক অনন্যা সৃষ্টি শকুন্তলা। শকুন্তলা চরিত্রের মধ্যে একদিকে আমরা দেখি মাতৃসুলভ লীলাবিলাস, চঞ্চলতা প্রভৃতি কোমলবৃত্তি, আবার দেখা যায় তপস্বিনীর কঠোর তপশ্চর্যার নিয়মানুবর্তিতা, সংযম প্রভৃতি। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য ভাবে শকুন্তলা চরিত্রের প্রতি আলোকপাত করেছেন। তাঁর কথায়– 'সে অরণ্যের সরলা মৃগীর মত, নির্ঝরের জলধারার মত, মলিনতার সংস্রবেও অনায়াসেই নির্মল।'

ভূষণপ্রিয়া, হাস্যমুখরা, উৎসবপ্রিয়া, মিষ্টভাষী-শকুন্তলার চরিত্রের বৈচিত্র্যপূর্ণ যে বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে তা বিশ্লেষণ করে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যে এক মহীয়সী নারীচরিত্র হিসাবে শকুন্তলাকে আমরা পাই।

যদিও 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' নাটকের উৎস মহাকবি মহাভারত থেকে গ্রহণ করেছেন তবুও শকুন্তলা কালিদাসের অভিনব সৃষ্টি। তার শারীরিক রূপলাবণ্য ছিল অসামান্য। রাজা দুষ্যন্তের মনে হয়েছে এরূপ দেহ সৌন্দর্য রাজান্তঃপুরেও দুর্লভ। কুসুমের মত পেলব তার যৌবন, কিশলয়ের রাগে রঞ্জিত তার অধর। এরূপ সৌন্দর্য শকুন্তলা জন্মসূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছে। শকুন্তলার এরূপ দেহলাবণ্য দেখে দুষ্যন্তের মনে হয়েছে সৃষ্টিকর্তা বিধাতা চিত্রপটে আগে তাকে অঙ্কন করে পরে তাতে প্রাণদান করেছেন। অথবা বিশ্বের সমস্ত রূপরাশিকে একত্রিত করে মনে মনে তাকে সৃষ্টি করেছেন। মহাকবির ভাষায় —

'চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত-সত্ত্ব-যোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতা নু।

স্ত্রী রত্নসৃষ্টির পরা প্রতিভাতি সা মে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।।'

শকুন্তলা চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল আত্মসম্মান বোধ। সাথে তার ছিল সলজ্জ সম্ভ্রমবোধ। সে কারণেই প্রিয়সখী অনসূয়া সেই প্রিয়ংবদার কাছে দুষ্যন্ত বিষয়ক প্রেমের কথা প্রথমে প্রকাশ করতে পারেনি। তার এই অবরুদ্ধ মানসিক প্রণয় তাকে শারীরিক ভাবে পীড়িত করেছে। শকুন্তলা যাঁকে পতিরূপে গ্রহণ করেছে তাঁকে সে সম্ভ্রম করে। দু:খভাগিনী শকুন্তলার জীবনে সর্বাপেক্ষা দুঃখের সময়ে তার পতিসম্ভ্রম অনির্বচনীয় শোভায় শোভিত ছিল। পতি কর্তৃক পরিত্যক্তা ভগ্নহৃদয়া, মলিন বেশধারিনী শকুন্তলা আশ্রয় নিল মহর্ষি মারীচের আশ্রমে। পরিত্যক্তা হবার পরেও দুষ্যন্তের প্রতি তার প্রেম ছিল অক্ষুন্ন। একবেনীধরা, বিরহক্লিষ্টা শকুন্তলা প্রেমেরই প্রতীক্ষা করছিল। মারীচাশ্রমে পুত্রের মাধ্যমে একদিন সহসা তার পতি সাক্ষাৎকার লাভ ঘটল।

শকুন্তলা চরিত্রে আমরা দেখি প্রকৃতির সঙ্গে তার নিবিড় অন্তরঙ্গ যোগ। তাকে প্রকৃতিরই অংশ বলে মনে হয়। পিতা কণ্ব তাকে আশ্রমের বৃক্ষে জলসেচনে নিয়োগ করলে সে সহোদর স্নেহে তাতে জলসেচন করে। সহকার তরুতে আশ্রিতা লতার সে সস্নেহে নামকরণ করে 'বনজ্যোৎস্না'। আশ্রমবৃক্ষে জলসেচন না করে সে নিজে কখনো জল পান করত না। সাজতে ভালোবাসলেও নিজে কখনো গাছের পাতা ছিঁড়ত না — পাছে তারা ব্যথা অনুভব করে।

'পাতুং ন প্রথমং ব্যবস্যতি জলং যুষ্মাস্বপীতেষু যা
নাদত্তে প্রিয়মণ্ডনাপি ভবতাং স্নেহেন যা পল্লবম্॥'

আশ্রমের হরিণ শিশুর মুখ যখন কুশঘাসের দ্বারা ক্ষত হয় তখন শকুন্তলা ঈঙ্গুদী তেলের প্রলেপ দেয়। গর্ভমন্থরা হরিণীর জন্য সে উদ্বিগ্না। হরিণ শিশুও শকুন্তলার এই প্রকৃতি প্রেম অনুভব করেছিল। তাই শকুন্তলার তপোবনাশ্রম থেকে পতিগৃহে যাবার প্রাক্কালে হরিণ শিশু তার কাপড়ের আঁচল ধরে টানে। যেন সে শকুন্তলাকে আশ্রমে ধরে রাখার কাতর আবেদন জানায় – 'যেতে নাহি দিব'।

শকুন্তলা এক পতিব্রতা ও বিরহব্রতচারিণী রমণী। পতিচিন্তায় মগ্ন থেকে সে দুর্বাসার দ্বারা অভিশপ্তা হয়েছে। দুষ্যন্তের রাজসভায় যখন সে দুষ্যন্ত কর্তৃক ভৎর্সিতা হয়েছে, দুষ্যন্ত তাকে চিনতে না পেরে পত্নীরূপে অস্বীকার করেছেন ; শকুন্তলা বহুভাবে তাদের গান্ধর্ব বিধিমতে কৃত বিবাহের প্রমাণ দিতে চেয়েও বারংবার ব্যর্থ হয়েছে। দুষ্যন্ত কর্তৃক নারীত্বের চূড়ান্ত অবমাননাকর মন্তব্য শোনার পরেও তার পাতিব্রত্য অম্লান থেকেছে। শেষে সে প্রতিবাদ করেছে, তীব্রভাষায় দুষ্যন্তকে ভৎর্সনা করে বলেছে— 'অনার্য, আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন..... প্রতিপৎস্যতে'। পতিগতপ্রাণা শকুন্তলা দুষ্যন্তের দ্বারা প্রত্যাখ্যাতা হলেও ভাবী মিলনের প্রত্যাশায় সব বিরহ দুঃখকে বরণ করে নিয়েছে। সব কিছুকে ভাগ্যের বিড়ম্বনা বলে সে মেনে নিয়েছে। বিরহব্রতচারিণী শকুন্তলা পরিশেষে দুষ্যন্তকে নির্দোষ বলে জেনে তাঁকে ক্ষমা করেছে এবং তাঁকে 'আর্যপুত্র' বলে সম্বোধন করেছে।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, শকুন্তলার সহজাত প্রকৃতিপ্রেম, আত্মমর্যাদাবোধ, প্রতিপ্রেম, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য শকুন্তলা চরিত্রকে বিশ্বসাহিত্যের দরবারে এক মহনীয় ও গৌরবোজ্জ্বল চরিত্র রূপে উপস্থাপিত করেছে। 'রূপে তোমায় ভোলাব না, ভালোবাসায় ভোলাব'— এই দর্শনের মূর্তবিগ্রহ শকুন্তলা দুষ্যন্তকে পেয়েছে রূপ সৌন্দর্য দিয়ে নয়, নিষ্কাম পবিত্র ভালোবাসা দিয়ে। আর এ কারণেই সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যাকাশে শকুন্তলা হয়ে উঠেছে অন্যতম মহীয়সী নারী চরিত্র।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। চক্রবর্ত্তী, সত্যনারায়ণ (২০০৮)
'মহাকবি-কালিদাস-প্রণীতম্ অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্'। কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
২। দত্ত, ডঃ প্রণব কুমার (২০০৬)
'মহাকবি-কালিদাস-কৃতম্ অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ একটি বিশ্লেষিত অধ্যয়ন'।
কলকাতা ঃ সংস্কৃত বুক ডিপো।
৩। ভট্টাচার্য, ড. হেমন্ত (২০০৩)। 'কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্যে নারীচরিত্র'। কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো।
৪। মল্লিক, রঘুনাথ (১৩৮২ বঙ্গাব্দ)। 'কালিদাস প্রতিভা'। কলকাতা।
৫। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ (১৩১৪ বঙ্গাব্দ)। 'প্রাচীন সাহিত্য'। কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ।

'রত্নাবলী' নাটিকার 'বাসবদত্তা' ঃ মহীয়সী রাজমহিষী

স্বপ্না রায় চৌধুরী, অতিথি অধ্যাপিকা, আশুতোষ কলেজ
ড. অর্ণব পাত্র, প্রধান, সংস্কৃত বিভাগ, আশুতোষ কলেজ

মহৎ-শব্দের উত্তর ঈয়সুন্-প্রত্যয়যোগে স্ত্রীলিঙ্গে প্রথমার একবচনে মহীয়সী শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। কীর্তিবশতঃ মহানতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। দর্পণে যেমন নিজের প্রতিবিম্ব লক্ষিত হয় ঠিক তেমনি সামাজিক ব্যক্তিবর্গের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি সাহিত্যিকদের রচনামুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়। বর্তমানে সমাজে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকলেও প্রাচীনকালে এই গণতন্ত্রের স্থান অধিকার করেছিল রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজারই সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সূত্রানুসারে রাজমহিষীও সমাজে উচ্চাসনে আসীন থাকতেন। কিন্তু রাজমহিষীরা যে শুধু নিশাকালের শশাঙ্কের ন্যায় অন্যের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হতেন তা নয়, তারা অনেকসময় নিজগুণেও মহানতার প্রতিরূপ হয়ে উঠতেন। সেই রকমই এক নারীচরিত্র হলেন শ্রীহর্ষদেবরচিত 'রত্নাবলী' নাটিকায় রাজা উদয়নের জ্যেষ্ঠা মহিষী বাসবদত্তা।

'রত্নাবলী' নাটিকাতে অরিজিত রাজা উদয়নের প্রধানা তথা জ্যেষ্ঠা মহিষী বাসবদত্তা ছিলেন নৃপবংশজা। তিনি উজ্জয়িনীর ভূপতি বা অবন্তিদেশাধিপতি প্রদ্যোতমহাসেনের পরম রূপবতী দুহিতা ছিলেন। তিনি যে রূপবতী ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর স্বামী উদয়নের বক্তব্যে —

'কুসুমসুকুমারমূর্ত্তির্দধতী নিয়মেন তনুতরং মধ্যম্।
আভাতি মকরকেতোঃ পার্শ্বস্থা চাপযষ্টিরিব।।' (১)

এত বিশেষণাধিক্য থাকা সত্ত্বেও বাসবদত্তা গর্বোদ্ধতা ও নির্দয়া ছিলেন না। সাধারণত: ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য মানবসত্তাকে দানবসত্তায় রূপান্তরিত করে, মানুষ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে কিন্তু বাসবদত্তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে রূপযৌবন ধনদৌলত এসব ক্ষণিকের অতিথি গুণই মানুষের জীবনতরণীর মাঝি। এই উপলব্ধিই বাসবদত্তাকে সাধারণ রমণী থেকে অসাধারণ রমণীতে পরিণত করেছে।

বাসবদত্তা ছিলেন ভক্তিমার্গের পথিক। স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলিপ্রদানেও তিনি সদা নিরত। মদনমহোৎসবকালে মদনপূজার পরে মকরন্দ উদ্যানে রক্তাশোকতরুতলে মদনোপম স্বামী রাজা উদয়নকে অর্চনা করেছেন।—

'অচ্চিদো ভঅবং পজ্জুস্মো, তাং করেহি ভত্তুণো উইদং পূআসক্কারম্।' (২)

মানুষের মধ্যেই দেবতার অধিষ্ঠান। তাই বাসবদত্তা মদনদেবতার মূর্তিপূজার পর মদনরূপধারী নিজ স্বামীরই অর্চনা করেছেন। নিজস্বামীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করার মধ্য দিয়ে পাতিব্রত্যধর্মের মর্যাদা রক্ষা করেছেন। স্বামীকে সাগরিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত দেখে বাসবদত্তা যে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়ে রাজাকে ভর্ৎসনা করেছিলেন তা আপাতদৃষ্টিতে দৃষ্টিকটু হলেও তা ছিল স্বামীর প্রতি প্রণয়েরই প্রকাশ —

'অজ্জউত্ত সচ্চং এব্ব অহং সাগরিআ। তুমং উণ সাঅরিওক্খিপ্পহিঅও সব্বং এব্ব সাঅরিআমঅং পেক্খসি।' (৩)

স্বামী উদয়নের হৃদয়রাজ্যের একাধিপত্য যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য বাসবদত্তা রত্নাবলীকে উদয়নের অগোচরে রাখার জন্য সদা ব্যাগ্র। তৎকালে রাজাদের বহুবিবাহ সমাজে প্রচলিত ছিল। তাই সাগরিকারূপ ইন্ধন উদয়নের হৃদয়রূপ যজ্ঞবেদীতে কামানলের প্রজ্জ্বলন ঘটাতে পারে এই আশঙ্কায় সাগরিকাকে অন্যকোনো কাজের অজুহাতে বাসবদত্তা উদয়নের দৃষ্টির অন্তরালে পাঠিয়ে দেন —

'হঞ্জে সাঅরিএ! কোস তুমং অজ্জ ভঅণমহসকারাহীণে পরিঅণী সারিঅং উজ্ঝিঅ ইহাগদা, তা তহিং জ্জেব্ব লহুং গচ্ছ, এদং বি সব্বং পূত্তবঅরণং কঞ্চণমালাএ ইত্থে সমপ্পে-হি।' (৪)

এরূপ বুদ্ধিমত্তা ও দূরদৃষ্টি প্রায়শঃ নারীচরিত্রে অলক্ষিত।

নদীর প্রবল জলোচ্ছ্বাস যেমন বাঁধ ভেঙে ধেয়ে চলে ঠিক তেমনি উদয়ন ও সাগরিকার পারস্পরিক প্রণয় বাসবদত্তার শতপ্রতিবন্ধকতাকে উপেক্ষা করে গড়ে উঠেছিল। ফলে স্বভাবত:ই নারীসুলভ ঈর্ষ্যায় ঈর্ষ্যান্বিত বাসবদত্তা সাগরিকাকে ও প্রণয়সহায়ক বিদূষক বসন্তককে শৃঙ্খলিত করলেও কোনো নিষ্ঠুরতা দেখান নি —

'হঞ্জে কংচনমালে এদেন এব্ব লদাপাসেণ বন্ধিঅ গেণহ এণং বমহণাং। দুব্বিণীদকণআং অ অজ্জদো করেহি।' (৫)

বাসবদত্তার হৃদয় যেমন কুসুমের মতন কোমল আবার ঠিক তেমনি পরিস্থিতিবিশেষে বজ্রের কঠোরতাযুক্ত। তাই বলা যায় —

'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি।' (৬)

সেকারণে স্বামীর আচরণে ক্ষুব্ধা হয়ে স্বামীকে ভর্ৎসনা করে অন্তঃপুরে চলে গেলেও রাজার মনোব্যথা লাঘবের জন্য আবার নিজেই তাঁকে অনুনয় করতে এসেছেন —

'হঞ্জে কঞ্চনমালে তং তধা চরণণিবড়িদং অজ্জউত্তং অবধীরিঅ আঅচ্ছদীত্র মত্র অদিণিট্টুরং কিন্দং, তা দাণিং সঅং জ্জেব্ব গদুঅ অজ্জউত্তং অণুণইস্সং। (৭)

বিদূষককেও শৃঙ্খলমুক্ত করে দিয়েছেন। বাসবদত্তা নিজে রাজার জ্যেষ্ঠামহিষী হওয়ায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিদূষককে তিনি কঠোর শাস্তি প্রদান করতেই পারতেন। কিন্তু ক্ষমতার সদ্ব্যবহার কি করে করতে হয় তিনি জানেন যা অধিকাংশ রমণীরই অজ্ঞাত।

বাসবদত্তা তার নিজের বহুমূল্য পোষাক দাসী কাঞ্চনমালাকে উপহারস্বরূপ দান করেন—

'অজ্জ ক্খু দেবীএ চিত্তফলঅবুত্তন্তসংবিন্দাএ সাঅরিঅং রক্খিদুং মম ইত্থে সমপ্পিঅন্তীএ জং ণেবত্থং মে পসাদীকিদং তেণ জ্জেব্ব বিরইদদেবীবেসং সাঅরিঅং গেণ্হিঅ অহং বি কঞ্চনমালাবেসধারিণী ভবিঅ পদোসে ইধ আগমিস্সং।' (৮)

বর্তমানযুগে অনেকেই সত্যিকারের দান করার মানসিকতা নিয়ে কোনোকিছু দান করেন না নিজেকে মহৎ দাতা হিসেবে প্রচার করাই মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে আর যাকে দান করছে সে যাতে দাতার অঙ্গুলিহেলনে চলে তার সুবন্দোবস্ত করাই দান করার অপর এক উদ্দেশ্য হয়ে থাকে। কিন্তু এদিক থেকে বাসবদত্তার মানসিকতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি উচ্চনীচ ভেদাভেদ না করে নির্দ্বিধায় নিজের বহুমূল্য পোষাক রাজান্তঃপুরের এক সামান্য দাসী কাঞ্চনমালাকে দান করেছেন।

ঐন্দ্রজালিক যখন রাজান্ত:পুরে অগ্নিদাহের সৃষ্টি করলেন তখন বাসবদত্তা মন থেকে সব ক্রোধের মালিন্য অপসারণ করে সাগরিকাকে রক্ষা করার জন্য উদয়নকেই পাঠালেন—

'অজ্জউও মএ অত্তণো কিদে ণ ভণিদং। এসা ক্খু মএ নিজ্ধিণাএ ইধ নিঅড়েণ সংজমিদা সাঅরিআ বিবজ্জদি, তা পরিত্তাঅদু অজ্জউত্তো।' (৯)

সাগরিকা উদয়নের প্রতি প্রণয়াসক্ত— একথা বাসবদত্তা জানেন। তাই সাগরিকার যদি অগ্নিদাহের ফলে মৃত্যু ঘটে তাহলে বাসবদত্তারই পথের কাঁটা দূর হবে। বাসবদত্তা যদি সাধারণ কোনো রমণী হতেন তাহলে সাগরিকাকে উদ্ধারের জন্য নিজ স্বামীকেই অনুরোধ জানাতেন না। এদিক থেকেই তিনি এক মহান নারীচরিত্র। নিজে নারী হয়ে অপর নারীর চরম সর্বনাশকামনা তিনি করেন নি বরং সাগরিকার প্রতি দয়ার ভাবকে জাগরিত করেছেন নিজ অন্তরে।

বাসবদত্তা যখন জানতে পারলেন নৌব্যসনে তার মামাতো ভগিনী রত্নাবলী মারা গেছেন তখন মূর্ছিতা হয়ে পড়েন। আবার যখন জানতে পারেন সাগরিকাই তার মামাতো ভগিনী রত্নাবলী তখনই পূর্বক্রোধ বিস্মৃত হয়ে তাকে আলিঙ্গন করেন—

'এহি অদিণিট্টুরে দাণীং বি দাব সিণেহং দংসেহি।' (১০)

ভগিনীস্নেহ ও পতিপ্রেম কোনোটিকেই তিনি অবহেলা করেন নি। ভগিনী রত্নাবলী যাতে জীবনে সুখী হতে পারে এবং স্বামীর সাগরিকার প্রতি ভালোবাসা যাতে পরিণতি লাভ করতে পারে সেজন্য তিনি নিজেই রত্নাবলীকে তথা সাগরিকাকে উদয়নের হাতে তুলে দেন —

'দেব পড়িচ্ছ এদং রঅণাবলীং।' (১১)

উদয়নের প্রতি বাসবদত্তার মনোভাব কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গানের পঙ্‌ক্তিকে স্মরণ করিয়ে দেয় —

'যদি আর-কারে ভালোবাস, যদি আর ফিরে নাহি আস,
তবে তুমি যাহা চাও তাই যেন পাও, আমি যত দুখ পাই গো।। (১২)

স্বামী উদয়নের প্রেমকে মর্যাদাপ্রদান করতে গিয়ে বাসবদত্তা নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। নিজের সুখস্বাচ্ছন্দ উদয়নের প্রতি প্রেমকে বেশী গুরুত্ব না দিয়ে

স্বামী উদয়ন কিসে সুখী হয় তার কথাই ভেবেছেন বাসবদত্তা। এই ধরণের আত্মত্যাগ সত্যিই বিরল। একজন সাধারণ মানবীর পক্ষে একাজ অসাধ্য বলাই ভালো। কিন্তু এই অসাধ্যসাধন করতে পেরেছিলেন বাসবদত্তা। তাই তিনি এই রত্নাবলী নাটিকার কঞ্চুকী বাভ্রব্যের মতানুসারে এক দেবীচরিত্র —

'স্থানে দেবীশব্দমুদ্বহসি।'

রূপের তুলনায় গুণই শ্রেয়ঃ। রূপ চিরকাল থাকে না কিন্তু গুণ চিরস্থায়ী। এই গুণের আতিশয্য একজন সামান্য মানুষকে অসামান্য করে তোলে। রত্নাবলী নাটিকার বাসবদত্তার মধ্যে রূপ ও গুণ দুয়েরই সমন্বয় পরিলক্ষিত হয়। তাঁর মধ্যে এমন কতকগুলি গুণ আছে যা অধিকাংশ স্ত্রীরত্নের মধ্যে বিরল। সেগুলিই এক রাজমহিষীকে মহীয়সী রমণীতে পরিণত করেছে — এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই।

সহায়ক-গ্রন্থপঞ্জী

১। শ্রীহর্ষদেবপ্রণীতা 'রত্নাবলী', সম্পাদক—শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সদেশ পাব্লিকেশন, সংস্করণ ২০০৮, ১/২০ পৃ. ৯০
২। তদেব, পৃ. ৯৭
৩। তদেব, পৃ. ২৯৩
৪। তদেব, পৃ. ৮৬
৫। তদেব, পৃ. ৩২৫
৬। মহাকবি ভবভূতিরচিত 'উত্তররামচরিতম্', সম্পাদক – ড. শ্যামাপদ ভট্টাচার্য, সংস্কৃত বুক ডিপো, জানুয়ারী ২০১০, ২/৭, পৃ. ১০২
৭। শ্রীহর্ষদেবপ্রণীতা 'রত্নাবলী', সম্পাদক-শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সদেশ পাব্লিকেশন, সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ৩১৭
৮। তদেব, পৃ. ২৪০
৯। তদেব, পৃ. ৪০৮
১০। তদেব, পৃ. ৪২৯
১১। তদেব, পৃ. ৪৩৯
১২। 'গীতবিতান'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলিকাতা, সংস্করণ পৌষ ১৩৮০, পৃ. ৩২৭
১৩। শ্রীহর্ষদেবপ্রণীতা 'রত্নাবলী', সম্পাদক—শ্রী অশোককুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সদেশ পাব্লিকেশন, সংস্করণ ২০০৮, পৃ. ৪৪১

হিরন্ময়ী দেবী ঃ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির এক আলোকিত অধ্যায়

ড. প্রত্যূষকুমার রীত

সমকালীন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম পরিবার হয়ে উঠেছিল জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতিটি ক্ষেত্রেই এ বাড়ির সদস্যরা পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন। রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ আশ্চর্য প্রতিভা উৎসারিত হয়েছে এ বাড়ি থেকেই। এ বাড়ির মহিলা সদস্যরাও খুব একটা পিছিয়ে ছিলেন না। স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী, হিরণ্ময়ী দেবী বা সুষমা-শোভনাসুন্দরী দেবীরা সেকালের প্রেক্ষিতে অনেক অগ্রবর্তিনী ছিলেন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা তথা স্বর্ণকুমারী দেবীর পরিচয় আজ আর নূতন করে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল জানকীনাথ ঘোষালের। তাঁদের প্রথম সন্তান হীরণ্ময়ী দেবী।

স্বর্ণকুমারী দেবীর বড় মেয়ে তথা সরলা দেবীর বড় দিদি হিরণ্ময়ী দেবী সমকালীন নারীপ্রগতিকর্মে, মহিলা শিল্প-শিক্ষাক্ষেত্রে এক উজ্জ্বল নাম। সখিসমিতির কার্যকলাপের ইতিহাসে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা ছাড়াও তিনি লিখেছিলেন কয়েকটি গল্প, অনেকগুলি কবিতা, অজস্র প্রবন্ধাদি, স্মৃতিকথা, জীবনকথা, ভ্রমণকথা, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ, সামাজিক প্রবন্ধ, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ ইত্যাদি অসংখ্য রচনা। হিরণ্ময়ী দেবী তেমনভাবে আলোকিত হয় নি, অথচ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির তিনিও এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। সেই ইতিহাসকেই আলোকিত করে তুলে ধরা হল এই প্রবন্ধে ও অতি সম্প্রতি প্রকাশিতব্য এক গ্রন্থে। পাঠক অনুভব করবেন, নারীচর্চার ধারাতেও হিরণ্ময়ী দেবীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

স্বর্ণকুমারীর দ্বিতীয় সন্তান জ্যোৎস্নানাথ ঘোষাল (১৮৭০-১৯৬২) ঠাকুরবাড়ির দ্বিতীয় আই.সি.এস.। স্বর্ণকুমারী দেবীর তৃতীয় সন্তান সরলা দেবীর জন্ম ০৯.০৯.১৮৭২ (১৮৭২-১৯৪৫)। ১৮৭৭ সালে জানকীনাথ বিলেত গেলে স্বর্ণকুমারী জোড়াসাঁকোর বাড়িতে পুত্রকন্যাসহ বাস করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভাগ্নী, রবীন্দ্রনাথের থেকে মাত্র ৭ বছরের ছোট হিরণ্ময়ী দেবীর জন্ম ৫.১২.১৮৬৮। জীবনাবসান ১৩.০৭.১৯২৫।

মা স্বর্ণকুমারী দেবী এবং বাবা জানকীনাথ ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা।

৩১.১০.১৮৬৯ তারিখে তাঁর নামকরণ ও অন্নপ্রাশন অনুষ্ঠান হয়েছিল ব্রাহ্মধর্মমতে। তাঁর শিক্ষা প্রথমে ডাভটন স্কুলে, পরে বেথুন স্কুলে। বেথুন বিদ্যালয় থেকে মধ্য ইংরেজি ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন তিনি (১৮৮১ সালে)।

বিবাহ ১৮৯৪-এর মার্চে সরকারী কলেজে বোটানির অধ্যাপক ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়-এর সঙ্গে। হিরন্ময়ী দেবীর বিবাহ-উপলক্ষেই জ্যোতিরিন্দ্র-স্বর্ণকুমারী-অক্ষয় চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ মিলে 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাটিকাটি রচনা করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা থেকে জানা যায়, তখন বিবাহসভাতে বাড়ির মেয়েরা উপস্থিত থাকতে পারতেন না। সেকারণে বিবাহ-বাসরের জন্য রবীন্দ্রনাথের 'বিবাহ-উৎসব' গীতিনাটিকা রচনা করে অভিনয় করিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের বড় মেয়ে সরোজা হয়েছিলেন নায়িকা। পরে এই নাটিকাকেই পরিবর্তিত করে রবীন্দ্রনাথ 'নলিনী' নামক গদ্যনাটক রচনা করেন। এই নাটকের ৪৫ টি গানের মধ্যে ২৮ টি রবীন্দ্রনাথের লেখা। হিরন্ময়ী দেবীর বিবাহের পর ঠাকুর বাড়ির অনেক বিবাহ অনুষ্ঠানেই এই নাটকের অভিনয় হয়েছে।

ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬০-১৯২৭)-এর সঙ্গে হিরন্ময়ী দেবীর বিবাহ হয় ১৮৮৪ সালে মার্চ মাসে। সরলা দেবী তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন-''দিদির বিবাহ হয় ষোল বৎসর বয়সে আমাদের পিসেমশায়ের (পরেশনাথ মুখোপাধ্যায়) ভ্রাতুষ্পুত্র ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। সিমলার বাড়িতে থাকতেই ফণিদাদা পিসেমশায়ের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসতেন। তখন থেকেই তাঁর দিদিকে বিয়ে করবার ইচ্ছা হয়। সেই অভিলাষ পূর্ণ করার জন্যে গিলক্রিস্ট স্কলারশিপের প্রচেষ্টায় কৃতকার্য হয়ে বিলেত যান (১৮৭৮)। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে উদ্ভিদবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্রে অনার্স পান এবং রসায়নে স্বর্ণপদক লাভ করেন। সেখান থেকে গবর্ণমেন্টের এডুকেশন সার্ভিস নিয়ে এসে প্রথমে প্রেসিডেন্সি কলেজে বোটানির অধ্যাপক হন। তারপরে রাজসাহী ও হুগলি কলেজে বদলি হন। শেষ জীবনে প্রেসিডেন্সী ও বর্ধমান ডিভিশনে ইন্সপেক্টার হন। যতদিন কলকাতায় ছিলেন দিদিরা কাশিয়াবাগানেই থাকতেন"।

ফণিভূষণ 'বিলাতে ছাত্রজীবন' প্রবন্ধে জানিয়েছেন, ১৮৭৮ সালের অক্টোবরে তিনি বিলাত পৌছান। এসময় রবীন্দ্রনাথও বিলাত যান। দুজনের সেখানে দেখা হয়েছিল কিনা তা জানা যায় না। ১৯১৫ তে ফণিভূষণ সরকারী কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন এবং তিনবছর ইন্দোর রাজ্যে শিক্ষা অধিকর্তার কাজ করেন। 'ভারতী' পত্রিকায় তাঁর অনেক বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁর দুটি পুস্তকও প্রকাশিত হয়েছিল শিক্ষাবিষয়ে।

হিরন্ময়ী দেবীর পর পর অনেকগুলি সন্তানবিয়োগ ঘটে। সাংসারিক জীবনে তিনি পূর্ণতা পান নি। তাঁর হৃদয় স্নেহদানের জন্য ছিল বুভুক্ষিত।

সরলা দেবীর স্মৃতিকথা গ্রন্থ থেকে জানা যায়-''উপর্যুপরি অনেকগুলি সন্তান বিয়োগ হয় দিদির। তাঁর হৃদয় স্নেহদানের জন্য বুভুক্ষিত ছিল। তিনি সখিসমিতির আশ্রিত কোনো কোনো অনাথ বালিকাদের নিজের কাছে রেখে পালনের জন্য উন্মুখ হলেন। তাঁরাই তাঁকে মা বলে। ঠিক নিজের মেয়ের মতো তাঁদের জন্য সব করেন তিনি।......এই শিল্পাশ্রমটি তাঁর একান্ত উদ্যম, বিপুল অধ্যবসায়, অনেক দ্বন্দ্ব ও অনেক প্রীতি দিয়ে গড়া। সখিসমিতিকে কালোপযোগী রূপান্তর দেওয়ার প্রচেষ্টায় বিধবা শিল্পাশ্রমের জন্ম।......."

দুঃস্থ হিন্দু বালিকা ও বিধবাদের কথা ভেবে হিরন্ময়ী দেবী একটি বিদ্যালয় ও শিল্পশিক্ষাশ্রম স্থাপন করেছিলেন। এই আশ্রমে প্রস্তুত শিল্পসামগ্রী বিক্রীর জন্যই 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার' (৭নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট) স্থাপিত (১৯০৩) হয়। দোকানের ম্যানেজার ছিলেন সরলা দেবী। ১৯০৫ সালে এই দোকান থেকেই রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত ভাণ্ডার পত্রিকাও প্রকাশিত হয়।

সরলা দেবীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় – তাঁর দিদি হিরন্ময়ী দেবী প্রবল কর্মক্ষমতা সম্পন্না মহিলা ছিলেন –

"...........দিদির ভিতরে নেতৃত্বভাব ছিল বলেছি–সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থাশক্তিও ছিল। তাঁর প্ল্যান করা, তাঁর দ্বারা Conducted tour -এ ফণিদাদার [ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়] কলেজের ছুটির সময় আমরা বছর বছর দেশভ্রমণে বেরোতে লাগলুম। ফণিদাদাকে টেনে হিঁচড়ে দিদিই নিয়ে যেতেন। যা কিছু বন্দোবস্ত দিদিই করতেন – স্টেশনে স্টেশনে নামা, ব্রেকভ্যান থেকে লগেজ নামান, সঙ্গী চাকরকে দিয়ে খাওয়া দাওয়ার জোগাড় করা – এসবেরই কর্তা দিদি। ফণিদাদা জোড়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধাক্কা খাওয়া একখানা জলিবোটের মত বিরক্ত হয়ে গজর গজর করতে করতে চলতেন। শেষ গন্তব্যে পৌঁছে থিতিয়ে বসে তবে স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বাঁচতেন।........"

ভারতী পত্রিকা সম্পাদনা হিরন্ময়ী দেবীর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি থেকে অনেকগুলি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। তার মধ্যে প্রথম ও সর্বাধিক স্থায়ী (৯০ বৎসর) পত্রিকা হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'। পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৭৬৫ শকের ১ ভাদ্র (১৬ আগস্ট ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। ঠাকুরবাড়ির দ্বিতীয় পত্রিকা 'ভারতী' পারিবারিক পত্রিকা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করলেও ধীরে ধীরে তা পারিবারিক সীমানা অতিক্রম করে জনসাধারণের পত্রিকা হয়ে উঠে। ভারতীর সময়কাল শ্রাবণ ১২৮৪ থেকে কার্তিক ১৩৩৩। এটি ৫০ বৎসর স্থায়ী হয়। সমকালে প্রকাশিত প্রতিবিম্ব, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্যদর্শন, বান্ধব, ভ্রমর প্রভৃতি পত্রিকাগুলির প্রকাশ বড় অনিয়মিত ছিল। সেকারণে স্থির একটা সাময়িক পত্রের প্রয়োজন অনুভব করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভারতী শুরুর আগে। ভারতী পত্রিকার চল্লিশ বর্ষ পূর্তিতে

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এ বিষয়ে স্মৃতিকথনটি আমাদের প্রায় সকলেরই জানা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'একখানা নূতন-পত্র' বার করার কথা দ্বিজেন্দ্রনাথও তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন। যাইহোক ভারতীর ১ম সংখ্যাতেই সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ 'ভূমিকা'তে পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন। ভারতী প্রথম প্রকাশিত হয় ১৫ শ্রাবণ ১২৮৪ (২৯ জুলাই ১৮৭৭) তারিখে। প্রথম সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'মেঘনাদবধ কাব্য' নামক সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়, যা নিয়ে লেখক পরে জীবনস্মৃতিতে আত্মস্বীকারোক্তি জানিয়েছেন।

দীর্ঘ ৫০ বছরের জীবনে 'ভারতী' পত্রিকার ১৭ বছর সম্পাদনা করেছেন পুরুষ সম্পাদক এবং ৩৩ বছর সম্পাদনা করেছেন মহিলা সম্পাদক। প্রত্যেকেই জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সদস্য বা বড়জোর আত্মীয়-স্বজন। সর্বোপরি ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার বেশীর ভাগ অংশ জুড়ে আছেন স্বর্ণকুমারী দেবী বা তাঁর মেয়ে হিরন্ময়ী দেবী ও সরলাদেবী। সম্পাদনার কালানুক্রমটি নিম্নরূপ –

শ্রাবণ ১২৮৪ – ১২৯০ — দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর
১২৯১ – ১৩০১ — স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩০২ – ১৩০৪ — হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী
১৩০৫ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৩০৬ – ১৩১৪ — সরলা দেবী
১৩১৫ – ১৩২১ — স্বর্ণকুমারী দেবী
১৩২২ – ১৩৩০ — মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় ও সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়
১৩৩১ – ১৩৩৩ — কার্তিক-সরলা দেবী

দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রথম সাত বৎসর সুচারুরূপে সম্পাদনা করেন। তারপর স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী সম্পাদনা করে প্রথমে ১১ বৎসর ও পরে সাত বৎসর, মোট ১৮ বৎসর। স্বর্ণকুমারী তাঁর ভূমিকায় পত্রিকার উদ্দেশ্য ও নবপরিকল্পনার কথা জানিয়েছিলেন। তিনি বিজ্ঞানের উপর জোর দেন। নূতন বিভাগ চালু করেন। বিদেশী সাহিত্য অনুবাদে সযত্ন হয়েছিলেন। এখানে 'বিদেশী ফুলের গুচ্ছ' বিভাগে রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বিদেশী কবিতার অনুবাদ করান। স্বর্ণকুমারীর আমলে পত্রিকার মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি। স্বর্ণকুমারী দেবী এখানে মহিলা লেখকদের সমাবেশ ঘটান উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

স্বর্ণকুমারীর সম্পাদনাকালে নাম না থাকলেও তাঁর মেয়ে হিরন্ময়ী দেবী ও সরলার যে প্রচুর পরিমাণে হাত ছিল তা বলাইবাহুল্য। মায়ের পর সেকারণে দুই মেয়েই পত্রিকার লাগাম ধরেছিলেন। বৈশাখ ১৩০২ থেকে স্বর্ণকুমারীদেবী শারীরিক কারণে পত্রিকার সম্পাদনা ত্যাগ করলে দুই মেয়ে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করলেও সরলা দেবী তখন মহীশুরে কর্মরত। ফলত হিরন্ময়ী দেবীর ভূমিকাই ছিল বেশী। পত্রিকার প্রতি দুই বোন সর্বদা সচেতন ছিলেন। তারই ফলস্বরূপ তাঁরা মামাকে (রবীন্দ্রনাথকে) পত্রিকার সম্পাদনাভার দেন।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনা গ্রহণ করেন ভাগ্নীদের (হিরন্ময়ী দেবী ও সরলা দেবী) চাপেই। হিরন্ময়ী দেবী লিখেছেন "তিন বৎসর কাল আমরা দুই ভগিনী ভারতীর সম্পাদক ছিলাম। আমি কিন্তু একটি দিন ও মাতুল মহাশয়কে ভারতী গ্রহণের জন্য ভজাইতে ছাড়ি নাই।......ক্রমাগত জল ঢালিলে পাথরও ক্ষয় হয় মামা মহাশয়েরও আমার প্রতি করুণার উদ্রেক হইল। তিনি ভারতীর সম্পাদন ভার গ্রহণ করিতে অর্থাৎ লিখিতে ও লেখা নির্বাচন করিতে সম্মত হইলেন। ম্যানেজারী করা, লেখা সংগ্রহ করবার ভার আমার উপর রহিল। এইরূপে পুনরায় ভারতীকে যোগ্য হস্তে সমর্পণ করিয়া আমার সে কি আনন্দ! তবু মামাটির স্বভাব আমার জানা ছিল – বেশীদিন যে এ আনন্দ ভোগ করা আমার ভাগ্যে ঘটিবে না মনে মনে তাহা বুঝিতাম।"

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদনাভার গ্রহণ করলেও 'ম্যানেজারি করা' ও লেখাসংগ্রহের কাজ করতেন হিরন্ময়ী দেবীই। হিরন্ময়ী দেবীর সম্পাদনাকালের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। পাঠক সেখানে পত্রিকার নেপথ্য-ইতিহাস দেখতে পাবেন। সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলি এক অর্থে স্মৃতিকথা। মামাকে ঘিরে হিরন্ময়ী দেবীর আশংকা অচিরেই সত্যে পরিণত হয়। এক বৎসর পরেই সম্পাদনা ত্যাগ করেন রবীন্দ্রনাথ।

যাইহোক রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' কে নূতন করে গড়ে তুললেন 'সাধনা'-র মতো করে। সে এক বিস্তৃত ও কৌতূহলমূলক ইতিহাস। ১৩০৫-এর চৈত্র মাসে কাজের চাপে রবীন্দ্রনাথ সম্পাদকত্ব ত্যাগ করেন। এতে সরলা দেবী মামার উপর ক্ষুব্ধ হন। যার জের অনেকদিন চলেছিল। ১৩২২-এ ভারতী সম্পাদনার জন্য ভাগ্নীর অনুরোধ কবি আর মানেন নি। তাছাড়া পরবর্তী সময় সরলার 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথ তাঁর চোখের বালি'-লেখা দেন নি।

যাইহোক 'ভারতী'র সবশেষে সম্পাদনা করেন সরলা দেবী। আগে পরে মিলিয়ে তিনি ১৫ বছর সম্পাদনা করেছেন ভারতী। সরলার উদ্দীপ্ত কর্মপ্রচেষ্টা ভারতীতে নূতন প্রাণসঞ্চার করেছিল। নির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশ এবং 'ভারতী'র দপ্তরকে ঢেলে সাজানো-সবই তিনি করেছিলেন। সরলা দেবীকে শেষদিকে হিরন্ময়ী দেবী কতটা সহযোগিতা করতেন, সে ইতিহাস গবেষণা-সাপেক্ষ। তবে বিভিন্ন সময় যে হিরন্ময়ী দেবী ভারতীতে লেখা দিয়েছেন, তা হিরন্ময়ী দেবীর রচনার তালিকাটি থেকে সহজেই বোঝা যায়।

সামাজিক কার্যকলাপের পাশে ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার সূত্রে হিরন্ময়ী দেবীর সাহিত্যকর্মও ক্রমশ বিস্তৃতিলাভ করেছিল। হিরন্ময়ী দেবী মাত্র চারটি গল্প রচনা করলেও প্রায় অর্ধশত কবিতা রচনা করেন। মৎ-সম্পাদিত 'ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের গল্প' গ্রন্থে (পুনশ্চ) হিরন্ময়ী দেবীর গল্পগুলি উদ্ধার করেছিলাম। হেমেন্দ্রকুমার রায় লিখেছেন 'কবিতায় শ্রীমতী হিরন্ময়ী দেবীর হাত বড় মিষ্ট ছিল। সরলতায় ও

ভাবমাধুর্য্যে তাঁহার কবিতাগুলি সকলেরই প্রাণস্পর্শ করিত। দুঃখের কথা, শ্রমতী হিরন্ময়ী তাঁহার ক'ব্যচর্চা সম্পূর্ণ করেন নাই"।

হিরন্ময়ী দেবীর প্রবন্ধের সংখ্যাও প্রায় অর্ধশত। প্রবন্ধগুলি নানা বিষয়ের। কিছু স্মৃতিকথা, জীবনকথা ছাড়াও সামাজিক প্রবন্ধ, শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধ, ভ্রমণকথা, বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ প্রভৃতি লিখেছেন। মৎ-সম্পাদিত 'ঠাকুর বাড়ির ভ্রমণকথা' (পত্রলেখা) গ্রন্থে হিরন্ময়ী দেবীর লেখা কয়েকটি ভ্রমণকথা সংযুক্ত করেছিলাম। তাঁর প্রথম রচনা ভারতী পত্রিকার দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত হয়, 'রাশিয়া'। মা স্বর্ণকুমারী দেবী ভারতী পত্রিকার সম্পাদিকা হওয়ায় এ পত্রিকায় লেখার তাগিদ অনুভব করেন বা বোন সরলা সম্পাদিকা হলে লেখার জন্য কলম ধরতে হয়েছে। জ্ঞানদানন্দিনী দেবীর 'বালক' পত্রিকাতেও তাঁর লেখা আছে। প্রবাসী পত্রিকায় তাঁর লেখা পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল। মায়ের কাছেই তাঁর ভারতী পত্রিকার সম্পাদনার হাতে খড়ি। সখিসমিতির উপর তাঁর লেখা একটি স্মৃতিকথা অত্যন্ত মূল্যবান রচনা। হিরন্ময়ী দেবীর শিক্ষাবিষয়ক প্রবন্ধগুলিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, নিউহ্যাম কলেজে তিনবৎসর অতিবাহিত করেছিলেন তিনি। হিরন্ময়ী দেবীর স্বামী ছিলেন বিজ্ঞানের অধ্যাপক। স্বামীর সাহচর্যেই হোক, বা নিজের শিক্ষার প্রেরণাবশেই হোক হিরন্ময়ী দেবী কতকগুলি বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধও লেখেন। হিরন্ময়ী দেবীর সাহিত্যকর্মও এক বিস্তৃত ও বিচিত্র প্রসঙ্গ।

সানন্দে জানাই, অতি সম্প্রতি এক সুবিখ্যাত প্রকাশনা থেকে মৎ সম্পাদনায় 'হিরন্ময়ী দেবীর রচনাসংগ্রহ' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবে ; সেখানে তাঁর জীবনেতিহাস ও সাহিত্য কর্মের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাঠক পাবেন।

নারী তুমি মহীয়সী

চাঁদমালা খাতুন

অতি কুৎসিত স্থানে জন্মগ্রহণ করে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রমের চেষ্টায় ও অধ্যাবসায়ে ভারতীয় রঙ্গমঞ্চে যিনি ধনে ও যশে চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন তিনি নটী বিনোদিনী। একটি বৃক্ষে শত শহস্র ফুল ফুটলে ও সব ফুলে ফল ধরে না। অনেক ফুল ঝরে যায়। কতক শুকিয়ে যায়, আবার কতক ফল ধরবার পূর্বেই পোকায় কেটে নষ্ট করে দেয়। এমন অনেক ফুল আছে যাদের ফল ধরবার ক্ষমতা নেই। অনেক ফুলের ফল ধরবার শক্তি থাকলেও নানা কারনে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু বিনোদিনীর ফুল রঙ্গমঞ্চে প্রস্ফুটিত হয়ে যশের সৌরভে দিগন্তকে মাতোয়ারা করে এমন একটি চিরস্থায়ী ফল আমাদের প্রদান করেছে, যে ফলের আস্বাদ আজও বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা নাট্যমোদী প্রত্যেকেই ভোগ করছে।

তৎকালীন সময়ে সমাজ, পরিবার এমনকি শাসকবর্গও নারীকে সেভাবে সম্মান দেননি। তেমনিভাবে বিনোদিনীও সমাজ থেকে সেভাবে কোন সম্মানও মর্যাদা পাননি। নটী বিনোদিনী দাসী আপন প্রতিভা বলে ও কার্যদক্ষতায় উচ্চশিখরে নিজেকে পৌছে দিয়েছিলেন। দারিদ্র্যের চরম অভাব অনটন ও অন্ধকার থেকে নিজেকে আলোর দিকে আপ্রাণ চেষ্টায় তুলে ধরেছেন। বিনোদিনীর মতো এ-রকম মহীয়সীর সংখ্যা অনেক কম। পাঁকে যেমন পদ্মফুল জন্মায়, বিনোদিনী যেন তাই-ই। বিনোদিনী যেন পাঁকের ভিতর থেকে উঠে আসা মহীয়সী নারী। তিনি তার অসামান্য কর্ম দক্ষতায় নাট্য জগতে প্রবেশ করেন। প্রথাগত যোগ্যতা সামান্য হলেও আত্ম বিশ্বাসের সঙ্গে থিয়েটারে অভিনয় করে প্রতিভাধারী নারীর মর্যাদা লাভ করেন।

বিনোদিনীর জন্ম ১৮৬২/১৮৬৩ সালে কলকাতায়। তার মা ও দিদিমার তত্ত্বাবধানে তিনি বড় হয়েছেন। তার বাবার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। তার পারিবারিক অবস্থা একেবারে দুস্থ ও শোচনীয়। খোলার চালের বাড়ি ছিল। তার মধ্যে দু একখানি ঘর ভাড়া দেওয়া হয়। এই ঘরভাড়া থেকে যা রোজগার হত তা দিয়ে তাদের সংসার চলত। এমনকি অলংকার বিক্রি করেও তাদের দিন অতিবাহিত হত। তার পরিবারের লোকজন এই ছোট মেয়েটিকে পুঁটি নামে ডাকত। তাঁর একটি পাঁচ বছরের ছোট ভাই ছিল। চরম দারিদ্রের মধ্য দিয়ে তার বেড়ে ওঠা। এমনকি সংসারের অভাব মোচনের জন্য

তার মা ও দিদিমা, তার থেকে বয়সে ছোট ভাই (বয়স আনুমানিক আড়াই বছর), তার বিয়ে দিয়ে কিছু পণ পায়। তা দিয়ে কিছুদিন দারিদ্রের অভাব দূর হলেও আবার আগের অবস্থাতেই ফিরে আসে। পুঁটি কে তার ছোটবেলার খেলার সাথীর সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাসে শেষ পর্যন্ত তার স্বামীর সংসার করা হয়নি। ছোট বেলায় তিনি স্বামী থাকতেও স্বামীকে যেমন কাছে পান নি তেমনি তার আদরের একমাত্র ভাইকে চিরতরে হারিয়ে একেবারে একা হয়ে যান।

তাদের এই দুঃসময়ে গঙ্গাবাঈ নামে এক ভাড়াটিয়া তাদের বাড়ি ভাড়া নেয়। গঙ্গাবাঈ থিয়েটারে গান গায়। বিনোদিনীর মা দারিদ্রের কারণে তাকে পড়াতে পারে নি। কিন্তু তার গানের গলা ছিল। তাই তিনি গঙ্গাবাঈ এর কাছে বিনোদিনীকে গান শেখানোর ভার দিলেন। গঙ্গাবাঈ বিনোদিনীর থেকে বয়সে বড় হলেও দুজনের মধ্যে সখ্যতা গড়ে ওঠে। বিনোদিনী গঙ্গাবাঈ-কে "গোলাপ ফুল" বলে সম্বোধন করতেন। বিনোদিনী অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সুমধুর গান আয়ত্ব করে নিলেন। সুর, রাগ, তাল, লয়, জ্ঞান আয়ত্ব করা যেন এই মেয়ের সহজাত ক্ষমতা। গঙ্গাবাঈ এর ঘরে গানের আসর বসত। সেখানে গানের সমজদার জ্ঞানী গুণীদের অবিরত যাতায়াত ঘটত। তাঁর (বিনোদিনীর) গান গাইবার ক্ষমতা তাঁর জীবনের পরিবর্তন নিয়ে আসে। যদিও অভাব-অনটন তার জীবনে পরিবর্তনের অন্যতম কারণ। এমনকি তাঁর জীবন পরিবর্তনে গঙ্গাবাঈ এর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। গঙ্গাবাঈ এর সান্নিধ্যে এসে বিনোদিন্ীর জীবনের চূড়ান্ত পরিবর্তন ঘটে যায়। তৎকালীন সময়ে বারাঙ্গনারাই গান গাইত। সমাজ এদেরকে তখন ভালো নজরে দেখত না। গঙ্গাবাঈ এর আসরে পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও ব্রজনাথ শেঠ প্রমুখ ব্যক্তিদের আগমন ঘটতো। তাঁরাই বিনোদিনীকে দশটাকার মাইনের বেতনে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে ভর্তি করিয়ে দেন। এখান থেকেই পুঁটি থেকে বিনোদিনী হয়ে ওঠা জীবনের বাঁক ও মোড়ের সুচনা হয়। মহেন্দ্রলাল বসুর হাতে বিনোদিনীকে তৈরীর ভার দেওয়া হয়। এরপর তাকে আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয় নি। খুব দ্রুত তিনি শিখরের দিকে ক্রমশ উঠতে থাকেন।

বিনোদিনী অসাধারণ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই ক্ষমতার বলেই অভিনয়জগৎ ও জীবন তার কাছে মিলে মিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল। ১৮৭৪ সালে মাত্র ১১ বছর বয়সে ব্রজনাথ শেঠ ও পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখের হাত ধরে অভিনয়ের আঙিনায় প্রবেশ করেন। তাঁর প্রথম অভিনীত

নাটকের নাম 'সংহার'। সেখান থেকে তিনি দ্রৌপদীর সহচরী রূপে অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনয় নাট্য জগৎকে মুগ্ধ করে তুলেছিল। বিনোদিনী তার আত্মজীবনীতে তাঁর বিবরণ দিয়ে গিয়েছেন-

> "..... আসিবার সময় সমস্ত দর্শক আনন্দধ্বনি করিয়া করতালি দিতে লাগিলেন। ভয়েই হউক, আর উত্তেজনাতেই হউক আমার তখন গা কাঁপিতে ছিল। ভিতরে আসিবামাত্র অধ্যক্ষেরা কত আদর করিলেন। কিন্তু তখন করতালির কি মর্ম্ম তাহা জানিতাম না। পরে সকলে বুঝাইয়া দিয়াছিলেন যে কার্যে সফলতা লাভ করিলে সকলে আনন্দে করতালি দিয়া থাকেন।"

সেই সময় সমাজের ভদ্র ঘরের নারীরা থিয়েটারে অভিনয় করত না। তাই স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বারাঙ্গনা নারীদের দিয়ে অভিনয় করানো হত। বিনোদিনী সেই পাঁক থেকে উঠে আসা এক মহীয়সী নারী। 'সংহার' নাটকে আভিনয় করার পর শ্রীযুক্ত হরলাল রায় এর 'হেমলতা' নাটকে অভিনয় করেন। এই নাটকে তিনি মুখ্য নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন। এই নাটকের অভিনয়ের মহরা চলার সময়ে দর্শকমণ্ডলী বলতে লাগলেন যে-'না, মেয়েটা পার্টটা মন্দ করবে না। হেমলতা চরিত্রে অভিনয় করে তিনি থিয়েটারের সকল দর্শককে একেবারে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। বিনোদিনী তার ঐকান্তিক অধ্যাবসায় ও দক্ষতায় একজন প্রথম শ্রেণির অভিনেত্রীর মর্যাদা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তার অপরিসীম কর্ম দক্ষতায় তার থেকে বয়সে বড় অন্যান্য অভিনেত্রীদের কাছাকাছি পৌছে গিয়েছিলেন। বিনোদিনী তার আত্মকথায় তার বর্ণনা দিয়েছিলেন – "সেই সময় হইতে আমি প্রায়ই প্রধান প্রধান পার্ট অভিনয় করতে বাধ্য হইতাম। আমার অগ্রবর্তী অভিনেত্রীগন যদিও আমার অপেক্ষা অধিক বয়স্কা ছিলেন, তথাপি আমি অল্প দিনের কাজেই তাহাদের হইয়াছিলাম।" রঙ্গমঞ্চে এত অল্প দিনের মধ্যে এত সুন্দর অভিনয় আজ পর্যন্ত কোন অভিনেত্রীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় নি।

গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে বিনোদিনী মাত্র ১৯ মাস অভিনয় করেছিলেন। তারপর তিনি শ্রী শরৎচন্দ্র ঘোষের বেঙ্গল থিয়েটারে মাত্র ২৫ টাকা মাসিক বেতনে যোগদান করেন। বিনোদিনী এরপর থেকে যশ ও খ্যাতির শিখরে পদার্পণ করেন। বেঙ্গল থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ অভিনেত্রী যথা বনবিহারিণী, সুকুমারী প্রমুখের অভিনয়ের জায়গা বিনোদিনী আপন প্রতিভাবলে দখল করতে থাকেন। বিনোদিনী মেঘনাদবধ কাব্যের সাতটি নাটকের নারী চরিত্রে একাই

অভিনয় করেছিলেন মহড়া চলাকালীন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'মৃণালিনী'তে মনোরমার ভূমিকায় বিনোদিনীর অভিনয় দেখে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই মুগ্ধ হয়ে মন্তব্য করেছিলেন-

> "আমি মনোরমার চরিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো সে প্রত্যক্ষ করিব অমন আশা করি নাই। আজ বিনোদের আভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।"

বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের নায়িকা চরিত্রে বিনোদিনীই অভিনয় করেছিলেন। বিনোদিনীর অভিনয় দেখার জন্য বেঙ্গল থিয়েটারে অনেকের যাতায়াত ঘটতো। বেঙ্গল থিয়েটারে বিনোদিনীর অভিনয় দেখে একদা কেদারনাথ চৌধুরী মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন –

> "এই মেয়েটি যেন প্রকৃত কপালকুন্ডলা, ইহার অভিনয়ে বন্য সরলতা যেন একেবারে সবুজ হইয়া ওঠে।"

১৮৭৭ সালে গিরিশচন্দ্রের হাত ধরে কেদারনাথ চৌধুরীর ন্যাশানাল থিয়েটারে বিনোদিনীর আগমন ঘটে। এক প্রকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শরৎচন্দ্র ঘোষের কাছে অনুরোধ করে বেঙ্গল থিয়েটার থেকে ন্যাশানাল থিয়েটারে বিনোদিনীকে নিয়ে আসেন। এরপর বিনোদিনীর নাট্য জীবনের প্রকৃত সাধনা শুরু হয়। নিজেকে মেলে ধরার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। নাট্যাচার্যের নিবিড় পরিচর্যায়, খোলস ছেড়ে স্বপ্রতিভায় আবির্ভূত হলেন এই মহীয়সী নারী। এই সময় তিনি বিষবৃক্ষে- কুন্দ, সধবার একাদশীতে-কাঞ্চন, পলাশীর যুদ্ধে- ব্রিটেনিয়া চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। তার অভিনয় দর্শক মন্ডলীকে অভিভূত করতো। ক্রমশ তিনি সমগ্র ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ মঞ্চাভিনেত্রী হিসাবে সকলের দৃষ্টি কেড়ে নেন। বাংলার নাট্যজগৎ তার দিকে অভিভূত হয়ে চেয়ে রইল। এমনকি বাংলার নাট্যজগতের অপরিহার্য শক্তির অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন। নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বীকার করেছেন যে- তার নাটকের সাফ্যলের মূলেই রয়েছে বিনোদিনী দাসী।

ঘটনাচক্রে ন্যাশানাল থিয়েটার নিলামে উঠলে শ্রী প্রতাপচাঁদ জহুরী নামে এক মাড়োয়ারী নতুন স্বত্বাধিকারী হিসাবে আসন গ্রহণ করেন। প্রতাপলাল বাবু তখন গিরিশচন্দ্র ঘোষকে থিয়েটারের অধ্যক্ষ হিসাবে নিযুক্ত করেন। এই সময় গিরিশ ঘোষের বিভিন্ন নাটক যেমন- মোহিনী প্রতিভা, আলাদিন, রাবন বধ,অভিমুন্য বধ, সীতার বনবাস, সীতার বিবাহ, রামের বনবাস, ভোট মঙ্গল, পাণ্ডবের অজ্ঞাত বাস প্রভৃতি নাটকের অভিনয় সুখ্যাতি অর্জন করেছিল।

কারণে অকারণে প্রতাপলাল বাবুর সঙ্গে বিনোদিনীর বচসা হয় এবং তিনি থিয়েটার ছেড়ে চলে যান। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও অমৃতলাল মিত্রের অনুরোধে তাকে আবার থিয়েটারে ফিরতে হয়। তাদের মধ্যে শর্ত হয় যে, নিজেরা একটি নিজস্ব থিয়েটার গড়ে তুলবে।

একদা প্রতাপলাল জৌহুরীর সঙ্গে গিরিশচন্দ্র ঘোষের মতান্তর ঘটে। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষের পক্ষে থিয়েটার নির্মাণ করা সম্ভব নয়। ঠিক তখনই গুর্মুখ রায় নামে এক মাড়োয়ারী যুবক শিল্পী সমাজের থিয়েটার গড়ার সমস্ত ব্যায়ভার বহন করতে এগিয়ে আসে। কিন্তু এর পিছনে তার শর্ত ছিল যে, এর বিনিময়ে তার বিনোদিনীকে চাই। অর্থাৎ বিনোদিনীর বিনিময়ে তিনি থিয়েটার গড়ে দেবেন। গুর্মুখ রায় এর ভাষায়-

> "আমি থিয়েটার খুলিতে যত টাকা লাগে তাহার সমস্ত দিতেই প্রস্তুত আছি। কিন্তু আপনাদের অভিনেত্রী বিনোদনীকে আমার আশ্রয়ে থাকিতে হইবে। সেজন্যও আমি তাহাকে প্রচুর অর্থ দিতে রাজি আছি।"

বিনোদিনী থিয়েটারকে এত ভালোবাসিতেন যে একটি স্থায়ী নাট্যমঞ্চ পাওয়ার আশায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ সহ সেকালের নাট্যরথীরা তাকে মাড়োয়ারী নাট্য ব্যাবসায়িক গুর্মুখ রায়ের কাছে বিক্রি করে দিলে তিনি কোন অসম্মতি বা প্রতিবাদ করেন নি। প্রতাপলাল জহুরীর থিয়েটারে অভিনয় চলাকালীন বিনোদিনী এক যুবকের আশ্রয়ে ছিলেন। কিন্তু এখন তিনি ন্যাশানাল থিয়েটারের মালিক গুর্মুখ রায়ের আশ্রয়ে নিজেকে সঁপে দিলেন। প্রথম দিকে বিনোদিনী এক আশ্রয় ছেড়ে অন্য আশ্রয়ে যেতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। বিনোদিনীর কথায়-

> "তবে একজনের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া আন্যায় রূপে আর একজনের আশ্রয় গ্রহণ করিতে আমার বিবেক বাধা দিতে লাগিল।"

সুতরাং বিনোদিনীর মধ্যে মানবিক মূল্যবোধ কাজ করেছে কিন্তু একমাত্র থিয়েটারের জন্যই নিজের বিবেকের কাছে মাথা নত করেছেন।

বিনোদিনীকে গুর্মুখ রায় ৫০ হাজার টাকা দিতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন তিনি যেন থিয়েটার না করেন। কিন্তু বিনোদিনীর কাছে থিয়েটারই তার জীবনের ধ্যান-জ্ঞান। থিয়েটারের জন্যই তিনি নিজেকে সঁপে দিয়েছেন। সেই কারণে গুর্মুখরা প্রদত্ত টাকা নিতে অস্বীকার করতে পেরেছিলেন।

বিনোদিনীর নির্লোভ চরিত্রের পরিচয় আমরা পাই। বিনোদিনীকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে তার নামে বি-থিয়েটার হবে। থিয়েটার নির্মিত হল কিন্তু প্রতিশ্রুতি মতো বি-থিয়েটার নাম নয় বিনোদিনীকে বঞ্চনা করে গিরিশ বাবুদের কৌশলে থিয়েটারের নামকরণ করা হয়- 'স্টার থিয়েটার', ১৮৮৩-এর ২১শে জুলাই। কারণ এক বারাঙ্গনার নামে থিয়েটার নাকি সেকালের সমাজপতি ও ভদ্র সমাজের অনুমোদন পেত না। আসলে গিরিশ প্রমুখদের চোখে বিনোদ বড় অভিনেত্রী হলেও বারাঙ্গনার অতিরিক্ত কিছু নয়। এত বড় প্রবঞ্চনা বিনোদ ভুলতে চেষ্টা করলেন, মহড়ায় এলেন কিন্তু এসে বুঝলেন যে গোটা পরিবেশ পাল্টে গেছে। এরপর বিনোদিনী থিয়েটারে দু-তিন মাস না আসলে গিরিশ ঘোষ মধ্যস্থতা করে আবার বিনোদকে থিয়েটারে নিয়ে আসেন। ১৮৮৩ সালের ২১শে জুলাই দক্ষযজ্ঞ নাটকের মধ্য দিয়ে স্টার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। এই নাটকে বিনোদিনী সতীর ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শককে মুগ্ধ করে তুলেছিলেন। বিনোদিনীর সঙ্গে গুর্মুখ রায় ছিলেন দু মাস। ১৮৮৩ সালে গুর্মুখ রায় পারিবারিক কারণে স্টার থিয়েটার বিক্রি করতে মনস্থ করেন। গুর্মুখ রায় স্টার থিয়েটারের অধিকাংশ বিনোদিনীকে দিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু গিরিশচন্দ্র ঘোষ বিনোদিনীকে স্বত্ব দেওয়াতে বাধা দিলেন। আসলে একজন বারাঙ্গনার মালিকানায় থিয়েটার হোক, পুরুষ আধিপত্যে থাকা সেকালের সমাজ তা মেনে নিতে পারে নি। শেষ পর্যন্ত বিনোদিনীকে বঞ্চিত করেই মাত্র ১১ হাজার টাকার বিনিময়ে স্টার থিয়েটারের মালিকানা হস্তান্তরিত করা হল অমৃতলাল মিত্র সহ আরও চার জনের নামে। তথাপি বিনোদিনী ভগ্ন হৃদয় নিয়ে স্টার থিয়েটার ছেড়ে যান নি। থিয়েটারের মধ্যেই বেঁচে থাকতে চেয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালে ২ আগষ্ট অভিনীত 'চৈতন্য লীলা' নাটকে চৈতন্যের ভূমিকায় বিনোদের অভিনয় দেখে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন- 'আসল নকল এক দেখলাম'। বিনোদিনীর অভিনয় দেখতে রামকৃষ্ণদেব অনেকবার এসেছিলেন। বাংলা থিয়েটার বিনোদিনীর জন্যই সেকালে অভিজাত মহলে মর্যাদা অর্জন করেছিল। এই ভাবে বিনোদিনী সাধারণ নারী থেকে মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত হয়ে উঠে।

সমাজের গভীর অন্ধকার থেকে উঠে আসা এক অসহায় নারী তাঁর তন্ময় সাধনা ও দুরূহ সিদ্ধি আয়ত্ব করে থিয়েটারের জন্য নিজেকে নিমজ্জিত করে দিয়েছিলেন, সেই মহীয়সী নারী বিনোদিনীর নাট্য জীবন ছিল মাত্র ১২ বছর- (১৮৭৪-১৮৮৬)। এই বারো বছরে তিনি সেকালের সবকটি নাট্য মঞ্চ যথা- ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, বেঙ্গল থিয়েটার ও স্টার থিয়েটারে প্রায় ৮০ টি নাটকে ৯০ টিরও বেশি চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অভিনয় জগৎ থেকে তিনি নিজেকে যখন সরিয়ে নিলেন তখন তার বয়স মাত্র ২৩/২৪ বছর। তারপরও তিনি দীর্ঘ ৫৫ বছর বেঁচে ছিলেন। কিন্তু অভিনয় জগতে আর ফেরেন নি। বিনোদিনী থিয়েটারে অভিনয় চলাকালীন নিজেকে সাজ সজ্জায় দক্ষ করে তুলেছিলেন। তিনি নিজেই নিজের সাজসজ্জা করতেন। তাই অবসর কালীন সময়ে তিনি মাঝেমধ্যে থিয়েটারে নাটক দেখতে আসতেন। আবার তার সেই শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ অসুস্থ থাকা কালীন তিনি ছদ্মবেশে দেখা করতেও এসেছিলেন। বিনোদিনী দাসী যে কেবলমাত্র অভিনেত্রী ছিলেন তা নয়, তাঁর গুনও যথেষ্ট ছিল তার প্রমানও আমরা পাই। তাঁর লিখিত তিনখানি পুস্তক বঙ্গ সাহিত্য ভান্ডারে বিরাজমান।

১৮৮৬ সালে থিয়েটারের অভিনয় জগৎ থেকে বিদায় নেওয়ার পর উত্তর কলকাতায় এক হৃদয়বান ব্যক্তির আশ্রয়ে থেকে সংসার জীবন যাপন করতে থাকেন। তাদের এক কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। কন্যা শকুন্তলাকে আশ্রয় করে বিনোদিনী দাসী তার ফেলে আসা কর্দমাক্ত অতীত/ স্মৃতি ভুলে থাকার চেষ্টা করেন বা ভুলে যান। কিন্তু মাত্র ১৩ বছর বয়সে তার কন্যা মারা যায়। তার কন্যার মৃত্যু শোকে বিনোদিনী ভেঙে পড়েন। কিন্তু কন্যার মৃত্যুর দুবছর পর তাঁর অসময়ের আশ্রয় দাতারও মৃত্যু হয়। এই দুজনের মৃত্যু বিনোদিনীকে একেবারে নিঃস্ব, অসহায় ও একাকিনী করে দেয়। পুনরায় তাকে ১৪৫ নং কর্নওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে ফিরতে হয়। সেখানেই সবার অলক্ষে, অনাদরে অবহেলায় একদা সাধারণ নারী থেকে মহীয়সী নারীতে রূপান্তরিত বিনোদিনী দাসী পরলোক গমন করেন।

শ্রীমতি বিনোদিনী দাসী যে কেবলমাত্র অভিনেত্রী ছিলেন তা নয়। বঙ্গ রঙ্গালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁর সাহায্য না পেলে থিয়েটার স্থাপন করা হতো কিনা, সে বিষয়ে সংশয় ছিল। সুতরাং বিনোদিনী দাসীর নিকট নাট্যামোদী মাত্রেই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। এ বিষয় নিয়ে বিনোদিনী দাসী "আমার কথায়" লিখেছেন-

"আজ জগৎ জোড়া যশের বোঝা লইয়া সংসার ক্ষেত্রে যে 'স্টার থিয়েটারের' নাম উন্নত বক্ষে আবস্থান করিতেছে, সেও একদিন এই ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র স্ত্রীলোককে বিশেষ আত্মীয় বলিয়া মনে করিত। এক্ষণে

শত আরাধনায় যাঁহাদের একবার মাত্র দেখা পাওয়া যায় না, এমন দিন গিয়াছে যে এই অতি ক্ষুদ্রশক্তি আত্মত্যাগ না করিলে হইতো কোন আঁধারের কোণে তাঁহাদের পড়িয়া থাকিতে হইত।"

বিনোদিনীই সাধারণ বঙ্গ-রঙ্গালয়ের একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী। সমাজের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে উঠে এসে সাধারণ নারী থেকে মহীয়সী হয়ে উঠেছেন।

....

মহীয়সী নারী শৈবলী

জুবিন ইয়াসমিন

অতিথি অধ্যাপিকা, যোগমায়া দেবী কলেজ

শ্রী তারাপদ ভট্টাচার্য্যের লেখা 'কথা দ্বাদশ' এর অন্তর্গত 'শৈবলী' নামক গল্পটি। সময়কাল ১৯২০ সাল। সংস্কৃত সাহিত্যে কথা যা বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প নামে পরিচিত। ছোট গল্পের মধ্যে এমন কিছু না বলা কথা লেখক এমন ভাবে পাঠক বা সহৃদয়ের মধ্যে সঞ্চারিত করে যা সহৃদয়দেরকে ভাবাতে শেখায়। ছোটগল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'শেষ হইয়াও হইল না শেষ'। সংস্কৃত সাহিত্যে তেমনি এক ছোটগল্প হল 'শৈবলী'। গল্পের নাম দেখেই বোঝা যায় গল্পটি নারী কেন্দ্রিক। মেয়ে সম্পর্কে কবি সুকান্ত বলেছেন —

"'নাগ' যদি 'নাগা' হয়। 'সেন' হয় 'সেনা'
বড়ই কঠিন হবে মেয়েদের চেনা।।" — মেয়েদের পদবী

অর্থাৎ নারী সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট ধারণা কাজ করে। আবার বিবেকানন্দ বলেছেন 'সুন্দর মুখের জয় সর্বত্র'। অর্থাৎ নারী সুন্দরী, গুণী, সুশীলা, শুভ্রা বর্ণা— তবেই নারীর মর্যদা। তবে স্বাধীন ভারতে আজও নারীরা অপমানিতা, লাঞ্ছিতা ও নির্যাতিতা। ডিজিটাল দুনিয়ার যুগেও নারীদের চাপা আর্তনাদ কান পেতে শুনলে আজও হয়ত শোনা যাবে।

তেমনি এক লাঞ্ছিতা মেয়ে হল শৈবলী। দৈহিক বর্ণনা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে- 'কেকরা, কৃষ্ণা, খর্বা চ'। অর্থাৎ সে টেরা, কৃষ্ণবর্ণা ও বেঁটে। শুধু সে নিজের পিতা মাতার দ্বারা লাঞ্ছিতা না, লাঞ্ছিতা গোটা পাড়া প্রতিবেশীর কাছে। তার পিতামাতা তার বিবাহ সম্পর্কে যথেষ্ট চিন্তিত। কারণ তাদের মেয়ে সুশ্রী নয়। বালিকা শৈবলী ছোটবেলায় বাবা মায়ের চিন্তা গায়ে না মাখলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে শৈবলীর মধ্যে পরিবর্তনের ধারা লক্ষিত হয়। তাই কৈশর ও যৌবনের যে স্বাভাবিক নিয়ম তার থেকে শৈবলী বঞ্চিত না। তাই সে লুকিয়ে আয়নায় টিপ পড়ে দেখে। তাই সে রাতের অন্ধকারে অপরিচিত দোকানে গিয়ে কবরী সজ্জার কাছে লিপ্ত হয় এ যেন এক অভিসারের প্রক্রিয়া। মানুষের যে স্বাভাবিক প্রক্রিয়া (সহজাত) সমাজের চাপে তাকে বিসর্জন দিতে হয়। এ রূপ সৃষ্টি তো বিধাতার। তাই লেখক বলেছেন — 'বিধাতা

যথা তিলোত্তমাং সৃজতি তথা তিলাধমামপি'। তাহলে এই পার্থক্য সৃষ্টি কার? বিধাতার না সমাজে স্থিতশীল মানুষের। প্রকৃতির ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শৈবলীর জীবনে আসে বিবাহের ঋতু। বিবাহ উত্তর কালে শৈবলীর মায়ের মনে আশঙ্কা জাগ্রত হলেও গোবিন্দ (শৈবলীর স্বামী)-এর কাছে যথাযথ সম্মান পেয়েছে। কিন্তু তার লাজুক মন তখনও মেনে নিতে পারে নি যে সে স্বামীর ঘরে ঘরের লক্ষ্মী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গোবিন্দ শৈবলীকে জন্মজন্মান্তরের সঙ্গিনী মানলেও, শৈবলী নিজেকে তার আসনে অধিষ্ঠিত করতে পারেনি, তাই চন্দ্রমল্লিকা ফুল গাছ আনাতে সে হয়ে উঠেছে অভিমানী। হীনম্মন্যতায় ভুগতে ভুগতে সে ধীরে ধীরে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে এবং চন্দ্রমল্লিকাকে তার স্বামীর যোগ্য প্রিয়তমা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

শৈবলীর এই চরম পরিণতির জন্য দায়ী তথাকথিত সমাজব্যবস্থা। প্রতি পদে পদে তাকে অপদস্ত হতে হয়েছে। পিতা মাতা কানা ছেলের নাম রাখেন 'পদ্মলোচন' কিন্তু সে (শৈবলী) পিতা মাতার কাছেও লাঞ্ছিতা। এর পিছনে দায়ী সমাজব্যবস্থা। সমাজে পণ প্রথা না থাকলে হয়ত অপদস্ত হতে হত না। মানুষের সহজাত যে প্রবৃত্তি সেগুলোও যে অজান্তে রাতের অন্ধকারে বিসর্জন দিয়েছে। নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যেও যোগ্যপাত্রে নিরূপিত হলেও তার মন মেনে নিতে পারেনি। প্রতিনিয়ত তার মন সংস্কারের বেড়াজাল ভেঙ্গে পশ্চাতের দিকে ধাবিত হয়েছে। এরজন্য দায়ী তথাকথিত সমাজব্যবস্থা। নীরবে সে সহ্য করেছে মানুষ দ্বারা দূষণ যুক্ত সমাজের ধকল। ফলে সে ক্লান্ত, তাই সে মৃত্যুর দিকে ঢলে পড়েছে। নীরবে শৈবলীর চোখের জল পতিত হয়েছে। কত নারীর মনের কথা নীরবে প্রকাশ করে গেছে অবলীলাক্রমে তাই শৈবলী ঊনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ভারতবর্ষে আমার চোখে বিদুষী নারী। সে সমাজের নারী জাতির স্তম্ভস্বরূপ।

শৈবলী নিজের জীবনকে বিপন্ন করে সমাজের গতানুগতিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। কন্যা সন্তানের প্রতি পিতা মাতার যে কর্তব্য সেই পুরানো মানসিকতার নবরূপ উদ্ভাসিত হয়েছে। বালিকা মনের যে উৎফুল্ল ভাব, নারী ঘরের লক্ষ্মী এই যে চিন্তাধারা, রূপে প্রথমা না হলেও গুণে সে অগ্রাধিকারী, সন্তানের প্রতি মাতার যে মাতৃত্ব বোধ, গৃহবধূ রূপে তার যে গৃহিণী রূপ, পতিপরায়ণ বধূ রূপে তার যে কর্তব্য, কৃষ্ণবর্ণ হয়েও সে যে শ্যাম বর্ণের অধিকারী, সবথেকে বড় কথা সে যে এক মানুষ মনুষত্ব্যবোধ তাঁর মধ্যে শুভ্রের ন্যায় বিরাজমান যা আজকের আধুনিকমনা সমাজকে দৃঢ় ভাবে আলোড়িত করে। সেই সঙ্গে পরিয়ে দেয় এক অভিমানিনী নারী চরিত্রের। রবীন্দ্রনাথের লেখা 'শাস্তি'-গল্পে চন্দরার মুখে যে মরণ শব্দের দ্বারা সমাজের প্রতি দৃঢ় বিক্ষোভ তা একটি শব্দ হলেও তার তাৎপর্য ব্যাপক। তেমনি শৈবলী নীরবে শুভ্র চোখের জল ফেললেও তা আজকের সমাজের কাছে শুভ্রজ্যোতির্ময় মূর্তিরূপে প্রতিভাত হয়।

তাই 'শৈবলী' গল্পের শৈবলী নামক নারী চরিত্রটি আমার চোখে আজকের দিনে

মহীয়সী নারী। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'আরণ্যক' উপন্যাসে বর্ণিত শ্যামবর্ণা ভানুমতির প্রতিবিম্বস্বরূপ। এই শ্যামবর্ণা নারীর যে সৌন্দর্য তার প্রতিফলন লক্ষিত হয় বুদ্ধদেব গুহ-এর 'কোয়েলের কাছে' উপন্যাসে। সংস্কৃত সাহিত্যে বিদুষী নারী যথা শকুন্তলা, দ্রোপদী, সীতা, বসন্তসেনা ইত্যাদি চরিত্রের সাথে শৈবলী নামক নারী চরিত্রটি সমাসনে অধিষ্ঠিত। দেবী বহুরূপী দুর্গার রূপের সাথে সমাসনে অধিষ্ঠিত না হলেও, অসুরবিনাশিনী রূপে দেবী দুর্গার যে সেখানেই শৈবলী দেবী দূর্গার সাথে সমতুল্য। অসুররূপী শিক্ষিত সমাজের যে বিধ্বংসী রূপ তার নাশকারিণী হিসাবে শৈবলী চরিত্রটি প্রতিফলিত হয়েছে। শ্রীহীনা শৈবলীর অন্তরে যে ব্যথা তার ফল হিসাবে শৈবলীর চোখের যে শুভ্র অশ্রুবিন্দু তা পাঠক চিত্তের মনরূপ ভূমিতে পতিত হয়ে পাঠক চিত্তকে ব্যথিত করে। তাই শৈবলী নামক নারী চরিত্র অধুনাকালের মহীয়সী নারী। তাই রবীন্দ্রনাথের কথাতেই শেষকরি —

"কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি.............
কালো তারে বলে গাঁয়ের লোক
. . . .
. . . .
. . . .
কালো ? সে যতই কালো হোক
দেখেছি তার কালো হরিণ চোখ
কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি।" — 'গীতবিতান'

মূলগ্রন্থ :

শ্রী তারা পদ ভট্টাচার্য্য 'কথাদ্বাদশ', সম্পা. মানবেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ, ২০০৪।

সহায়ক গ্রন্থ :

গুহ বুদ্ধদেব - 'কোয়েলের কাছে' ; আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ প্রথম আনন্দসংস্করণ, মাঘ-১৯৩৮।
ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ- 'গল্প গুচ্ছ (গীতবিতান)' ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস ১৩১০ বঙ্গাব্দ।
ভট্টাচার্য সুকান্ত - সুকান্ত রচনা সমগ্র, শুভম্, ১৪১৬।
বন্দোপাধ্যায় বিভূতিভূষণ - 'আরণ্যক', মিত্র এণ্ড গোস্বামী পাবলিশার্স, ১৯৭৬।

অপার মহিমাময়ী অনন্যা নিবেদিতা

পুলিন দাস

মার্গারেট আলফ্রেড নোবল জন্মেছিলেন (২৮.১০.১৮৬৭) আয়ারল্যাণ্ডে। কৈশোর ও যৌবনের অনেকটাই কেটেছে তাঁর ওই অঞ্চলে। তাঁর অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও তেজস্বিতায় এবং তৎসহ তাঁর চিন্তার অভিনবত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হয়েছেন সমকালীন বুদ্ধিজীবী মহল। বিজ্ঞানের পাঠ গ্রহণ করতে থাকেন প্রশ্নমনস্ক মার্গারেট। নানা প্রশ্ন তাঁর মনোজগতে। এমন সময় সাক্ষাৎ ঘটে (১৮৯৫) তাঁর স্বামী বিবেকানন্দের। বিবেকানন্দের বক্তব্যে,-ব্যাখ্যাবিশ্লেষণের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন তিনি। স্বামীজীর আদর্শে উদ্বুদ্ধ আলফ্রেড নোবল ভারতে আসার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জন্মভূমি আয়ারল্যাণ্ড ছেড়ে চলে আসেন ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতে। ভারতভূমি এবং তার সবকিছুকে ভালোবেসে লিপ্ত হন ভারতকন্যা হয়ে ওঠার সাধনায়। ঘুরে বেড়িয়ে, দেখেশুনে পরিচিত হলেন ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশ-ও তার মানুষজন এবং তাদের সামাজিক পরিস্থিতির সঙ্গে। অভিজ্ঞ করে তুললেন নিজেকে ভারতসংস্কৃতি ও তার ইতিহাস দর্শনে। ভারতকন্যা হয়ে ওঠার এই কঠিন সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে নিবেদন করলেন নিজেকে ভারতবর্ষ ও সেখানকার মানুষের সেবায়।

তাঁর বসবাসের সূচনা হলো বাগবাজার বোসপাড়া লেনের ছোট একটি ঘরে। সুরু হয়ে গেল তাঁর বহুমুখী কর্মধারা। বাস্তবায়িত হতে চললো বিবেকানন্দের আর্শীবাণী —

‘ভারতের ভবিষ্যৎ সন্তানের তরে
সেবিকা, বান্ধবী, মাতা - তুমি একাধারে।’

মেয়েদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে গড়ে তুললেন বিদ্যালয়। উদ্যোগ নিয়েছিলেন লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের হৃদয়ে স্বদেশচেতনার জাগরণে। বিদ্যালয়ের দৈনন্দিন কর্মসূচীর সূচনা হতে থাকলো ‘বন্দেমাতরম্’ সঙ্গীত সহযোগে। বিদ্যাচর্চার সঙ্গে হস্তশিল্পচর্চার ব্যবস্থাও রইলো। জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে উত্তোলিত হলো ছাত্রীদের দ্বারা প্রস্তুত নিবেদিতা পরিকল্পিত জাতীয় পতাকা-লালটুকটুকে জমির উপর সোনালী সূতোয় আঁকা বজ্র ও তার দুপাশে লেখা ‘বন্দেমাতরম্’। সর্বোপরি মানুষ হওয়ার শিক্ষা সাধনায় ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করে তোলায় উদ্যোগ নিয়েছিলেন নিবেদিতা।

প্লেগরোগ মহামারী আকারে দেখা দিল (১৮৯৯) কলকাতায়। নিজের জীবন তুচ্ছ

করে সেবাকর্মে নিবেদন করলেন নিজেকে। বস্তিবাসীর ঘরের প্লেগরোগাক্রান্ত শিশুকে কোলে তুলে নিয়ে তার শুশ্রূষায় নিরত দেখা গেল তাঁকে। বাগবাজার অঞ্চলের গলিপথে জমা আবর্জনা পরিষ্কার করার কাজে নেমে পড়লেন নিবেদিতা ঝাড়ু কোদাল হাতে নিয়ে। যুরোপীয় মহিলার এহেন সেবাকর্ম দেখে অনুপ্রাণিত পাড়ার যুবকদল ঝাড়ু কোদাল নিয়ে অনুসরণ করতে থাকে নিবেদিতাকে।

এবং নানাবিধ সেবাকর্মের পাশাপাশি চলেছে তাঁর নিজের লেখাপড়া। লিখেছেন
‘নিউইণ্ডিয়া’, ‘ডন’, ‘ইণ্ডিয়ান রিভিউ’ ‘মডার্ন রিভিউ’, ‘প্রবুদ্ধ ভারত’, ‘হিন্দু রিভিউ’
‘মাইসোর রিভিউ’, ‘বিহার হেরাল্ড’, ‘ঈষ্ট অ্যাণ্ড ওয়েষ্ট’, ‘সিন্ধু জার্নাল’, ‘বলভারতী’
ইত্যাদি সাময়িকীতে, এবং ‘অমৃতবাজার’, ‘ষ্টেটস্ম্যান’, ‘ইংলিশম্যান’ প্রভৃতি সংবাদপত্রে
দেশের আদর্শ ও দশের সমস্যা নিয়ে মূল্যবান রচনাবলী। দেশপ্রেম ও জাতীয় চেতনার
জাগরণে তাঁর তেজোদৃপ্ত অভিভাষণ উপস্থাপিত হয়েছে ষ্টার থিয়েটার, ‘ইয়ংমেনস্
হিন্দু ইণ্ডিয়ান কমিটি’, ‘গীতা সোসাইটি’ ‘ডন সোসাইটি’, ‘বিবেকানন্দ সোসাইটি’,
‘অনুশীলন সমিতি’। ‘গয়াকংগ্রেস’ (১৯০৫) প্রভৃতির নানা অনুষ্ঠানে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত ভাষণে লর্ড কার্জনের
মন্তব্য-প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচির লোকদের নিকট সত্য বিশেষভাবে সমাদৃত-শুনে
উত্তেজিত নিবেদিতা কার্জনরচিত ‘Problems of the Far East’ বইটি থেকে
কার্জনের মিথ্যাচারী মন্তব্য উদ্ধার করে অমৃতবাজার পত্রিকায় তা প্রকাশ করে কার্জন
যে মিথ্যাবাদী তা প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।

গবেষণার ক্ষেত্রে এবং তার প্রকাশনায় বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসুকে পদে পদে
বাধাপ্রাপ্ত হতে দেখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন নিবেদিতা। জগদীশচন্দ্র ছিলেন
নিবেদতার দৃষ্টিতে ‘Man of Science’। জানিয়েছিলেন তাঁকে- ‘আপনিই আধ্যাত্মিক
জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিক;— আবিষ্কার করে বলেছেন— নব নব জগৎ।... চিরবিজয় লাভ
করুন।’ বিজ্ঞান গবেষণা মন্দির প্রতিষ্ঠার আকুতি ছিল নিবেদিতার। ‘হতাশ ও অবসন্ন
বোধ করিলে আমি নিবেদিতার নিকট আশ্রয় লইতাম’ বলে জানিয়েছেন জগদীশ চন্দ্র।
অবলা বসু ছিলেন নিবেদিতার বন্ধু। ‘জগদীশচন্দ্রের জীবনের ইতিহাসে এই মহনীয়া
নারীর নাম সম্মানের সঙ্গে রক্ষার যোগ’ বলে ভেবেছেন রবীন্দ্রনাথ।

বোসপাড়া লেনের বাড়িতে চা-পান সভায় রবীন্দ্রনাথ ও বিবেকানন্দের একত্র
সন্নিবেশ ঘটেছিল নিবেদিতার সৌজন্যে। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে বিদ্যালয়
প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে আগ্রহী ছিলেন নিবেদিতা,- যদিও তা কার্য্যকর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ
ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন তিনি। ‘কাবুলিওয়ালা’, ‘দেনাপাওনা’, ‘ছুটি’
প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের অনুবাদ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে শিলাইদহে
এসে (১৯০৪) পল্লীজীবনের অন্তরঙ্গ স্পর্শলাভ করেছিলেন। বুদ্ধগয়ায় একত্রে ভ্রমণে
গিয়েছিলেন নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথ। পথস্বাতন্ত্র সত্ত্বেও পারস্পরিক শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন
তাঁরা। তাঁহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও

বুঝিয়াছিলাম তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাঁহার আর একটি জিনিস ছিল, সেটি তাঁহার যোদ্ধৃত্ব।....তাঁহার উদার মহত্ব তাঁহার উদগ্র প্রবলতাকে অনেকদূর ছাড়াইয়া গিয়াছিল। অতঃপর অসঙ্কোচে ব্যক্ত করেন রবীন্দ্রনাথ - 'একদিকে তিনি আমার চিত্তকে প্রতিহত করা সত্ত্বেও আর একদিকে তাঁহার কাছ হইতে যেমন উপকার পাইয়াছি, এমন আর কাহারো কাছ হইতে পাইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার সহিত পরিচয়ের পর হইতে এমন বারংবার ঘটিয়াছে, যখন তাঁহার চরিত্র স্মরণ করিয়া ও তাঁহার প্রতি গভীর ভক্তি অনুভব করিয়া আমি প্রচুর বল পাইয়াছি।....তিনি আমাদের চেয়ে বড় ছিলেন বলিয়াই আমাদের ভক্তির যোগ্য।'

জনসেবা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি শিল্পের প্রতি অনুরাগী ছিলেন নিবেদিতা। সুচারুসুন্দর ছিল তাঁর শিল্পবোধ। শিল্পচর্চার প্রেরণাময়ী নিবেদিতার বর্ণনায় লিখেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ–'......পাহাড়ের উপর চাঁদের আলো পড়লে যেমন হয় তেমনি ধীর স্থির মূর্তি তাঁর। তাঁর কাছে গিয়ে কথা কইলে মনের বল পাওয়া যেত, বলেছেন, 'ভারতবর্ষকে বিদেশী যাঁরা সত্যিই ভালোবেসেছিলেন তার মধ্যে নিবেদিতার স্থান সবচেয়ে বড়'। আরো দু'কদম এগিয়ে বিপিনচন্দ্র পাল লিখেছিলেন,- 'এই ইংরেজ মহিলা জীবন দিয়া যেভাবে ভারতবর্ষকে ভালবাসিয়াছেন, আমাদের দেশের বিশেষ করিয়া আধুনিক শিক্ষাভিমানীর মধ্যে খুব কম লোকই সেভাবে দেশকে ভালবাসেন'। নিবেদিতার ভারতপ্রেমে মুগ্ধ হয়েছিলেন গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অশ্বিনীকুমার দত্ত, ডাঃ নলিনীরঞ্জন সরকার, আনন্দমোহন বসু, তারকনাথ পালিত, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু প্রভৃতির মতো মনীষিবৃন্দ।

নিবেদিতার সহায়তা পেয়েছেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। নিবেদিতা রচিত কবিতা, প্রবন্ধ, শিল্প সমালোচনা, সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশ পেয়েছে 'মর্ডার্ন রিভিউ'-তে। ইংরেজীতে লেখা দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস'- গ্রন্থ সংশোধন করে দিয়েছেন নিবেদিতা। গ্রাম্য ছড়ার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উঠেছেন। অরবিন্দ ঘোষের স্বদেশী- ক্রিয়াকর্মের বিরুদ্ধে ইংরেজ শাসকের ব্যবস্থাগ্রহণের সংবাদ অবগত হয়ে অরবিন্দকে সাবধানী পরামর্শ দেন নিবেদিতা। অরবিন্দের পণ্ডিচেরীযাত্রার পাথেয় জগদীশবসু মারফতে দিয়ে দেন। 'কর্মযোগীন' সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেন নিবেদিতা। পুলিশের রোষদৃষ্টি গিয়ে পড়ে নিবেদিতার প্রতি। বাংলার গৌরবান্বিত বিপ্লবের যুগে (১৯০৫-১০) আদর্শস্থানীয়া হয়ে উঠেছিলেন আন্দোলন-সহযোগী নিবেদিতা। ইংরেজ শাসকের রক্তচক্ষুকে অগ্রাহ্য করে ভারতের মুক্তিসংগ্রামে নির্ভয়ে এগিয়ে গেছেন বিদ্রোহিনী নিবেদিতা। রামকৃষ্ণ মিশনের সদস্যদের সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ বিধায় দেশাত্মবোধের প্রেরণায় রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে সম্পর্কচ্যুত হতেও দ্বিধাবোধ করেন নি ভারতপ্রেমী নিবেদিতা।

স্বামী বিবেকানন্দ ও তাঁর বক্তব্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে একদা দেশ ছেড়ে চলে এসেছিলেন (১৮৯৮) মার্গারেট আলফ্রেড নোবল। বিবেকানন্দ সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত নোবল হয়ে উঠলেন নিবেদিতপ্রাণা ভারতভগিনী নিবেদিতা। অরবিন্দের 'শিখাময়ী', অবনীন্দ্রনাথের 'মহাশ্বেতা', ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের 'বিপ্লবদুহিতা' ও মাতা সারদাদেবীর 'খুকী' অতঃপর হয়েছেন লোকমাতা'। 'বস্তুত তিনি ছিলেন লোকমাতা। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সমগ্র দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে তাহার মূর্তি তো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।'– উপলব্ধি রবীন্দ্রনাথের।

বিদেশিনী- এক বিদুষী নারী অপর একটি দেশকে ভালোবেসে তাকে একান্ত আপন করে তুলে তার সেবায়-সংগঠনে ও তার মুক্তিসংগ্রামে আত্মোৎসর্গের এমন নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে বিরলতম সন্দেহ নেই। যথার্থই বলেছেন রবীন্দ্রনাথ– 'নিজেকে এমন করিয়া সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা আর কোন মানুষে প্রত্যক্ষ করি নাই। সে সম্বন্ধে তাঁহার নিজের মধ্যে যেন কোন বাধাই ছিল না। তাঁহার শরীর, তাঁহার আশৈশব য়ুরোপীয় অভ্যাস, তাঁহার আত্মীয় স্বজনের স্নেহমমতা, তাঁহার স্বদেশীয় সমাজের উপেক্ষা এবং যাহাদের জন্য তিনি প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন তাহাদের উদাসীন, দুর্বলতা ও ত্যাগস্বীকারের অভাব কিছুই তাঁহাকে ফিরাইয়া দিতে পারে নাই।'

চিরবিদায় নিয়ে অকালে চলে গেছেন তিনি (দার্জিলিং, ১৩.১০.১৯১১)। মহাপ্রস্থানের পথে তাঁর উজ্জ্বল উদ্ভাস– 'The boat is sinking but I shall see The Sunrise'

জন্মের সার্ধশতবর্ষে আজ এই মহামহীয়সী মানবীর উদ্দেশ্যে বিনম্র প্রণতি।

সন্ত মাদার টেরেসা ঃ ভালোবাসার সেবাদূত

ড. সুরঞ্জন মিদ্দে

৫৪এ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড। মাদার হাউসের এই ঠিকানা 'মিশনারীজ অফ্ চ্যারিটি'র মূলকেন্দ্র। যেখান থেকে সারা বিশ্বে যোগাযোগ চলে। মাদার টেরেসা এখানেই থাকতেন। এই বাড়িটির মালিক ছিলেন একজন মুসলমান। ডাক্তার ইসলাম ছিলেন ধর্মিক মানুষ। ডাক্তার ইসলাম সামান্য দামে বাড়িটি মাদারকে দিয়ে দিলেন, মানবসেবার কল্যাণে। যেদিন ডাক্তার ইসলাম বাড়িটিকে মাকে দিলেন, তাঁর চোখ জলে ভরে গেল। নামাজ পড়ে এসে কোন রকমে মাদারকে বললেন– 'খোদা আমাকে বাড়িটা দিয়েছিলেন, আমি তাঁকেই ফিরিয়ে দিলাম।'

আর একদিন একজন হিন্দু ভদ্রলোক মাদার হাউসে এসেছিলেন। সে সমাজের একজন উচ্চবর্ণের মানুষ। সে খুব চিন্তামগ্ন ছিলেন। তার মেয়েকে নিয়ে এমন এক সমস্যায় পড়েছিলেন, যা সমাধান হওয়া অসম্ভব ছিল। অবশেষে মায়ের কাছে তাদের সমস্যার কথা বলতে পেরে হালকা হলেন। তার একটি কন্যা সন্তান সম্ভবা হয়েছে। আর সেই কন্যার অজাত সন্তানের পিতা একজন নিম্নবর্ণের ভৃত্য।

মাদার টেরেসা জানতে চাইলেন, সন্তানের জন্য মায়ের কোন মায়া আছে? পিতা বললেন, কন্যা তার সন্তানকে রাখতে চান না। এই কথা শুনে মাদার সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিলেন। সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত সন্তানসম্ভবা মাকে 'শিশু ভবনে' রাখার নির্দেশ দিলেন। এই অসম্ভব সমস্যার সমাধান হলো। একটি নবজাত শিশু কর্ণের জীবন বাঁচানো হলো। রক্ষা করা সম্ভব হলো একজন নারীর সম্মান।

মাদার টেরেসার জীবন দর্শনের মূলকথা হচ্ছে-হিন্দুকে আরও ভালো হিন্দু হতে হবে। মুসলমানকে আরো ভালো মুসলমান। প্রত্যেককেই নিজের নিজের ধর্মবিশ্বাস অনুয়ায়ী আরও ধার্মিক হতে হবে। মাদারের কাছে সবাই সমান। মায়ের কাছে ধনী-দরিদ্র, জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সেবা পান। কি ধর্ম ? কি বর্ণ ? তার কোন আলাদা স্থান নেই। সবাই ঈশ্বরের সন্তান। যারা মাদারের আশ্রমে থাকে, তাদের সকলের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। পূজার সময় হিন্দুদের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। মুসলমানদের তাদের পরবে ছাড়া হয়। মুসলমান মারা গেলে কবরের ব্যবস্থা আর হিন্দু মারা গেলে দাহ করা হয়।

মায়ের শত্রু নেই। সবার কাছে তিনি শ্রদ্ধেয়। মাদার ধর্মের উর্দ্ধে। তাই তিনি
বাবরি মসজিদ ভাঙ্গার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে পায়ে হেঁটেই চলে যান—
একাকী। মাদার টেরেসার 'মিশনারিজ অফ্ চ্যারিটি' হাজার হাজার মানুষের কাছে
আশ্রয়ের প্রতীক। মাদারের মৃত্যু নেই। মা সন্তানের মধ্যে বেঁচে থাকবেন যুগ থেকে
যুগান্তরে।

কি আশ্চর্য এই পৃথিবীর মানুষ! যিনি বিয়ে করেননি, গর্ভে সন্তাণ ধারণ করেন
নি; তবুও তিনি মা। সকলের কাছে তিনি মা, মাদার টেরেসা। কেউ বলে মাদার
দেবী, কেউ বলে তিনি অনাথ জননী। জীবন্ত দেবীর মতো অনাথ আর মুমূর্ষ মানুষের
কাছে পৌঁছে যান খুব সহজেই। আজ পৃথিবীর মানুষের জয়গান, এক সময়ের স্কুলের
দিদিমনিকে স্পর্শ করতো না। ধন্যাঢ্য মানুষকে তিনি সবিনয়ে বলতে পারেন—
আপনাদের ব্যাঙ্কের চেক বই নিয়ে চলে যান। অর্থের চেয়ে তিনি চান ত্যাগ। দানের
চেয়ে চান সেবা। ত্যাগই মানুষকে পবিত্র করে। সেবাই মানুষকে আনন্দময় করে
তোলে। ভালোবাসার মাধ্যমে পাপী মানুষ ফিরে আসে আলোর পথে।

মানুষকে সেবা করা মানেই খ্রিস্টকে ভালোবাসা। দরিদ্র মানুষকে ভালোবাসা মানেই
ঈশ্বরের দর্শন পওয়া। মাদার এই চিরন্তন সত্যকে সকলের কাছে তুলে ধরতে চান।
কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর 'কলকাতার যীশু' নামক একটি কবিতার অসাধারণ কয়েকটি
লাইন মনে পড়ে,—

'মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে,
ভিখারী মায়ের শিশু
কলকাতার যীশু।'

একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক মাদারকে প্রশ্ন করলেন,– 'মাদার, আপনি কি কুষ্ঠ রোগীকে
স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করেন?'
মাদার টেরেসার চোখে মুখে অপার বিস্ময়ের রূপরেখা দেখা দিল। তিনি শান্তভাবে
ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন– 'আমি প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যিশুকে দেখি। ক্ষুধার্ত যিশুকে
অন্ন দিতে হবে। রোগার্ত যিশুকে শুশ্রূষা করতে হবে। গৃহহীন যিশুকে আশ্রয় দিতে
হবে। দরিদ্র যিশুকে বুকে টেনে নিতে হবে।'

প্রশ্ন– মাদার পৃথিবীতে অসংখ্য রোগার্ত মানুষের কতজনকে আপনি সেবা
করতে পারবেন?

মাদার টেরেসা, খুব চমৎকার উত্তর দিয়ে বলেছিলেন, বিশ্বের দুঃখ-সমুদ্রের এক বিন্দুও
দূর হলে, আমার জীবন সার্থক হবে।
আজ আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগে, কুষ্ঠ ও যক্ষা রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছে।
কিন্তু অবাঞ্ছিত হবার রোগ থেকে মানুষের মুক্তি নেই। সে রোগ দূর হতে পারে
শুধু ভালোবাসার যাদুমন্ত্রে। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দ। ইতিহাসে এক স্মরণীয় সাল। ক্রিমিয়ার
যুদ্ধ চলছে। ক্ষতবিক্ষত মৃত্যুপথযাত্রী সৈনিকদের সেবা করেছেন। সেই ফ্লোরেন্স

নাইটিংগেল এই বছরে দেহত্যাগ করেন। আর একই বছরে যুগোস্লাভিয়ার স্কপেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন আর এক মহীয়সী নারী। মাত্র আঠারো বছর বয়সে এই মহীয়সী নারী কলকাতায় আসেন।

১৯২৮ খ্রিস্টাব্দ। আঠারো বছর বয়সে হলেন শিক্ষিকা। কলকাতার ইন্টালির কাছে সেন্ট মেরীজ স্কুলের শিক্ষক। স্কুলে ভূগোল পড়াতেন। ভূগোল তাঁর প্রিয় বিষয়। সেন্ট মেরীজ থেকে লরেটো স্কুলে এলেন। হলেন 'ডটারস্ অফ্ সেন্ট অ্যান' এর ভারপ্রাপ্ত নান্। ইন্টালির এই লরেটো স্কুলের বাইরেই ছিল 'মেতি ঝিল' বস্তি। নামটা 'মোতি ঝিল' কিন্তু মোতি নেই আছে দুঃখ, অভাব, অসহনীয় যন্ত্রণা। খাবার জল নেই। আলো নেই। নীচু রাস্তায় জল জমে থাকে। স্কুল নেই। ঝগড়া ঝাটি এদের দৈনন্দিন জীবনের সাথী। লরেটো স্কুলের জানালা দিয়ে 'মোতিঝিলে'র মধ্যে ভারতবর্ষের দুঃখকে সর্বপ্রথম নিজের চোখে দেখলেন। মানুষের কষ্টকে আত্মস্থ করলেন মা। মাদার টেরেসা।

তখন ভারতবর্ষ পরাধীন। বস্তির অসহায় মানুষের জন্য ভাবনার সময় নেই। সমস্যায় জর্জরিত অসহায় মানুষের কষ্ট দেখে ছেড়ে দিলেন লরেটো স্কুলের শিক্ষকতা। চলে এলেন ১৪ নম্বর ক্রিকলেনের ছোট্ট একটি ঘরে। নিঃস্ব। একেবারে সহায়-সম্বলহীন তিনি। সঙ্গে মাত্র একজন সঙ্গী। সেবিকা 'চারুমা'। 'চারুমা' মাদারকে খুব ভালোবাসতেন। মাদারের সঙ্গেই ছিলেন আজীবন। শুধু একজন সঙ্গী। আর একটি কালো বাক্স। না ছিল চেয়ার, না ছিল টেবিল। বাক্সটাই তাঁর বসার জায়গা। হাতে পয়সাও নেই। মাঝে মাঝে রাতে অনাহারে থাকতে হয়। সারাদিন পরিশ্রম। পায়ে হেঁটেই বস্তিতে সেবা করা।

প্রথমদিন মাদার গেলেন সেই 'মোতিঝিল' বস্তিতে। সঙ্গে সম্বল মাত্র তিন আনা পয়সা আর দুটো সিদ্ধ ডিম। গিয়ে দেখলেন বস্তির একটি পরিবার অনাহারে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তিন আনা পয়সায় কিনে দিলেন মুড়ি। দিয়ে দিলেন ডিম দুটোও। একেবারে রিক্ত হয়ে হাঁটতে হাঁটতে ফিরে এলেন ক্রিকলেনে।

ঠিক করলেন ভিক্ষে করবেন। মানুষের জন্য অর্থসংগ্রহ করবেন। দীন-দুঃখী মানুষ। ধর্ম-বর্ণ-জাতি নির্বিশেযে মানুষের সেবার জন্য মাদার ভিক্ষা শুরু করেন। লরেটো স্কুলের নানে্র দামী পোযাক খুলে ফেললেন। শরীরে গ্রহণ করলেন ভারতীয় পোযাক। ভারতীয় নারীর শাড়ী। মেথরাণীদের পরিধেয় শাড়ী। সমাজে যারা ঘৃণিত, তথাকথিত নীচুশ্রেণি বলে উপেক্ষিত। সেই উপেক্ষিতাদের শাড়ী। সাদা শাড়ী নীল পাড়ের সেই শাড়ী সর্বপ্রথম মাদার পরলেন। সেই থেকে শুরু। আজ সারা বিশ্বে মাদারের 'মিশনারিজ অফ চ্যারিটির' সিস্টাররা এই পোযাকে পরিচিত। ভারতের অবহেলিত নারীর পোযাককে মর্যাদা দিলেন মাদার। নীলপাড় সাদা শাড়ীর উপর গেঁথে দিলেন একটি ক্রুশ। সঙ্গে বেছে নিলেন এক কষ্টময় জীবন।

সেবা করতে প্রয়োজন চিকিৎসা ও ওযুধপত্র সম্পর্কে নিতান্ত সাধারণ জ্ঞান। তিনি চলে গেলেন পাটনায়। নার্সিং ট্রেনিং নিয়ে ফিরলেন সেই ভালোবাসার শহর কলকাতায়। সম্বল মাত্র পাঁচ টাকা। শিয়ালদার কাছে পরিত্যক্ত কয়েকটি শিশুকে নিয়ে শুরু করলেন সেবার মহাযজ্ঞ। সেবাব্রতে ভালোবাসার সংসার। তিনি মা হয়ে গেলেন। অনাথ জননী মাদার টেরেসা। বিয়ে না করেও সকলের মা হয়ে গেলেন। বিশ্বজননী মাদার। আমাকে অনাথ শিশু দাও। মৃত্যু পথযাত্রীকে অসহায় মানুষকে আমার কাছে আনো। যার কেউ নেই, সবাই যাকে ত্যাগ করেছে। আমি ভালোবাসা দিতে চাই। হ্যাঁ ভালোবাসা। একমাত্র ভালোবাসাই যার জীবনের শ্রেষ্ঠ মূলধন।

প্রকৃত পক্ষে মায়ের কাছে সুখ-দুঃখের কোন ফারাক নেই। দুঃখের মধ্য দিয়েই আসে আনন্দ, অকৃত্রিম ভালোবাসা। 'Poverty is Freedom' দারিদ্রই স্বাধীনতা। এই চরম সত্যকে সামনে রেখে মাদারের প্রথম কাজ ছিল শিক্ষার সম্প্রসারণ। নিরক্ষরতার দেশে-সাক্ষরতার জন্য মাদারকে ভাবিয়েছিল। তাই তিনি ইন্টালির কাছে 'মোতিঝিল' বস্তিতে প্রথম স্কুলের পত্তন করলেন। চারদিকে ছোট ছোট ঝুপড়ি। খুপরীর মত কুঁড়ে ঘর। চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ কিছুই নেই। একজন বস্তিবাসী নিরক্ষর শ্রমিক কোদাল দিয়ে বিবর্ণ ঘাসগুলো পরিস্কার করলেন। খোলা আকাশের নীচে শুরু হল প্রাথমিক বিদ্যালয়। নরম মাটির উপর লাঠি দিয়ে লিখলেন প্রথম বাংলা অক্ষর।

একদিন কলকাতায় প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে ফুটপাতে একটি অসহায় মানুষ যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে মারা গেল। এই নিষ্ঠুর ঘটনাটি মাদারকে গভীরভাবে ভাবালো। তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন যেমন করেই হোক মুমূর্যদের জন্য একটি আশ্রয়স্থল গড়ে তুলবেন। দলে দলে দুঃস্থ, অসহায় মানুষ আসতে লাগলেন। কি আশ্চর্য পৃথিবীর মানুষ। যিনি বিয়ে করেননি। গর্ভে সন্তান ধারণ করেননি। তবুও তিনি মা, সকলের মা। কেউ বলে দেবী। আর্তের জননী।

ধনী লোকদের তিনি সবিনয়ে বলতে পারেন; আপনাদের চেক বই নিয়ে চলে যান। টাকার চেয়েও আমি ত্যাগ চাই, সেবা। ভালোবাসার মাধ্যমে বিপথগামী মানুষ ফিরে আসে আলোর পথে। মানুষকে সেবা করা মানে ঈশ্বরকে ভালোবাসা। মায়ের কাছে কেউ অবাঞ্ছিত নয়। আজ হাজার হাজার শিশু মহাভারতের কর্ণ। এই সব হতভাগ্য শিশুরা চিরবঞ্চিত। কত শিশু আজ মূক, বধির, বিকলাঙ্গ। মাদার এই সব শিশু দেবতাদের কুড়িয়ে এনেছেন ফুটপাথ থেকে, ডাস্টবিন থেকে। এই সব অনাথ শিশুরা মাদারের কাছে পেয়েছে নতুন করে বাঁচার ঠিকানা।

আজ শুধু এই কলকাতায় নয় ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে মাদারের অনাথ আশ্রম। শিশুভবন। দেশে-বিদেশে মাদারের কাজ ছড়িয়ে পড়েছে। ভারতবর্ষের সীমানা ছাড়িয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্তের দুর্গম স্থানে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাদারের আশ্রম। পৃথিবীর ১৮০ টি দেশে ৪০০ টি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তিনি। প্রায় পাঁচ হাজার সিস্টার এই বিশাল কর্মযজ্ঞে অত্মত্যাগ করে চলেছেন।

কুষ্ঠ রোগ বংশগত নয়। সংক্রামক তো নয়ই। অথচ কুষ্ঠ রোগীকে সবাই ঘৃণা করে। অবহেলা করে ...... এড়িয়ে যায়। মহাত্মা গান্ধী কুষ্ঠদের সেবা করেছেন নিজের হাতে। মাদার মহাত্মাকে সন্মান জানালেন। ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে থেকে মহাত্মাজির

তিরোধান দিবসে ৩০ জানুয়ারি 'কুষ্ঠ নিবারণী' দিবস পালিত হয়। শুধু খাতা-কলমে নয় বাস্তব রূপ দিলেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে মহাত্মাজির জন্মদিনে টিটাগড়ে 'গান্ধী প্রেম নিবাস' নামে কুষ্ঠ আশ্রম গড়ে তুললেন। ট্রেন লাইনের পাশে সুদীর্ঘ আশ্রমটি এক আশ্চর্য সৃষ্টি। পশ্চিমবঙ্গে প্রায় পাঁচ লক্ষ কুষ্ট রোগীর জন্য এই প্রেম নিবাস যথেষ্ট নয়। রাস্তায় রাস্তায় কুষ্ঠরোগীরা ভিক্ষার পাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। তিনি ওদের মাঝে চলে গেলেন। তাদের সঙ্গে কথা বলেন। শরীর স্পর্শ করে আদর করেন। কুষ্ঠ ক্ষত হাত দিয়ে ধুয়ে দিলেন। উপেক্ষিত আর ঘৃণিতরা খুঁজে পেল জীবনের নতুন আলো।

কুষ্ঠরোগীদের জন্য আলাদা একটি নগর তৈরী করলেন। বেশী দূর নয়- আসানসোলে। ৩৪ একর জমির উপর গড়ে উঠলো কুষ্ঠরোগীদের নগর। নাম শান্তিনগর। আজকে কুষ্ঠরোগ সারিয়ে তোলা সম্ভব। মাদারের চেষ্টায় ৫৫ টি কেন্দ্রে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কুষ্ঠরোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আজ তারা কেউ বসে নেই। তাদের উপার্জনের করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেউ নারকেল ছোপড়া থেকে পাপোশ শিল্পের নিপুণ শিল্পী। আবার কেউ প্রেসের ছাপাখানার কাজ। ছাপা হচ্ছে শিক্ষার বই। কুষ্ঠ প্রতিবন্ধী মানুষরা আজ মানুষের কীর্তিকে প্রকাশ করছেন। মানব সম্পদের শ্রেষ্ঠ প্রকাশকে। জেনেটিক্স থেকে যায়। কোন মানুষ কুষ্ঠ নিয়ে পৃথিবীতে আসে না। পৃথিবীর উপহার এই কুষ্ঠ ক্লেদ। যা সারিয়ে তোলা সম্ভব। কুষ্ঠ রোগী যে শিশু জন্ম দেয় সে সম্পূর্ণ সুস্থ। শিশুর মতো সদ্যজাত কুঁড়ি ক্রমশ বিকশিত ফুল। অবহেলার পরিবর্তে উপার্জন। অবজ্ঞার বিপরীতে কর্মশীল। মাদারের কাছে কেউ উপেক্ষার পাত্র নয়। সবাই তাঁর কছে সমান।

পৃথিবীর মানুষ সবাই ব্যস্ত। কে কার জন্য ভাবে? সবাই ছুটছে নিজের ছন্দে। সময় হলে আসুন না- ট্যাংরার 'শান্তিদান' আশ্রমে। শিয়ালদহের খুব কাছে। বৈশালী সিনেমার কছে। ঠিকানা ৩৭ নম্বর ট্যাংরা রোড, কলকাতা-১৫। বিশাল এলাকা জুড়ে গড়ে উঠেছে 'শান্তিদান'। নামের ভেতরে লুকিয়ে আছে ভালোবাসার অমৃতধারা। মাদারের সবচেয়ে স্নেহভাজন সিস্টার অ্যাগনেস নিজের হাতে সেবা করতেন এখানে। বিভিন্ন ধরনের কাজ শুরু হয়েছে। সমাজের অবাঞ্ছিতদের নিয়ে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ হচ্ছে জেলে বন্দিনীদের আশ্রয়। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন জেলের বন্দিনীদের এখানে নিয়ে আসা হয়েছে। যারা বহু বছর ধরে বিনা বিচারে বন্দিনী ছিল। প্রায় ৫০০ জন বন্দিনী আজ মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেয়েছে। জেলের গভীর অন্ধকারে যাদের চোখের জলের দাম কেউ দিতে পারেনি। যারা সমাজচ্যুত, যারা অবাঞ্ছিত, যারা হয়ে গিয়েছিল সমাজবিরোধী। যারা ক্রমশ ভাবতে শুরু করেছিল তাদের আর জীবনের কোন দাম নেই। ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যাবে মূল্যবান যৌবন। তারা কখনও ভাবেনি অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে কোনদিন। মাদারের আশ্রমে তারা আজ পরম ধন্য। তারা আজ নতুন জীবনের জীবিকা অর্জনের চেষ্টা চালাচ্ছে। যারা একদিন সমাজের চোখে অভিযুক্ত, তারা আজ মাদারের স্পর্শে হয়ে গেছে শান্তির দূত। 'শান্তিদান' তাদের জীবনের নতুন নদী। জীবনের ফল্গুধারা।

সবার উপরে মানুষ সত্য। আর সেই মানুষ রাস্তায় মরে পড়ে আছে। মৃত মানুষটির মুখে বেদনার চিহ্ন। মানুষটার কাছে কেউ নেই। মাদারের মনটা নীরব কান্নায় ভরে গেল। কারোর বিরুদ্ধে তাঁর কোন অভিযোগ নেই। সোজা চলে গেলেন কলকাতার মেয়রের কাছে। একটা জায়গা চাই। মুমূর্ষুদের জন্য ছোট্ট একটু জায়গা। এত বড় শহর কলকাতায় মুমূর্ষু মানুষদের জন্য কোন জায়গা নেই। মেয়র দিলেন কালীঘাট মন্দিরের অতিথিশালা। অতিথিশালা আর নেই সমাজবিরোধীদের আড্ডা। যত অপকর্মের ডেরা। মাদার নির্ভীক। এগিয়ে গেলেন সাহসভরে। গড়ে তুললেন বিশ্বখ্যাত 'নির্মল হৃদয়'। অত্যাচার শুরু করলো চারদিক থেকে। ইট পাটকেল পড়তে লাগলো "নির্মল হৃদয়ে'। সবার অভিযোগ বর্ষিত হল। এক বিদেশী খ্রিস্টান মহিলা হিন্দুদের জাত খাচ্ছে। সবাই দল বেঁধে ছুটলো পুলিশ কমিশনারের কাছে। বিপুল হইচই। পুলিশ কমিশনার, হাজির হতে বাধ্য হলেন। কমিশনার 'নির্মল হৃদয়ের' ভেতরে গেলেন। নিজের চোখে দেখলেন। একজন বিদেশিনী মা নিজের হাতে মৃত্যু পথযাত্রীদের সেবা করছেন। স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বেরিয়ে এলেন পুলিশ কমিশনার। উত্তেজিত জনতার সামনে দাঁড়ালেন পুলিশকর্ত্তা। চিৎকার হচ্ছে বিদেশিনী দূর হটো। চিৎকার থামিয়ে পুলিশ কমিশনার আবেগে আপ্লুত হয়ে বললেন— বিদেশীনীকে তাড়িয়ে দেব। কিন্তু বিদেশীনীর আরোধ্য কাজ করবে কে? আপনারা ফিরে গিয়ে নিজেদের মা-বোনদের নিয়ে আসুন। আমি এই মহৎ কাজকে বন্ধ করতে পারিনা। উত্তেজিত জনতা নিঃস্তব্ধ হয়ে গেল। মাথা নীচু করে আস্তে আস্তে সরে পড়লো সবাই। কলকাতার পুলিশ কমিশনার 'নির্মল হৃদয়ে' ফিরে গেলেনে। বললেন, আশ্রমের পাশেই মায়ের মন্দির। মন্দিরে আছেন পাথরের মা। আর 'নির্মল হৃদয়ে' আছেন জীবন্ত মা।

এরপর মায়ের মন্দিরের একজন পুরোহিতের কলেরা হল। বন্ধুরা তারা তাকে বাইরে ফেলে দিল। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ে কেউ তাকে স্পর্শ করছে না। অবশেষে মাদার এগিয়ে এলেন। নিজের হাতে 'নির্মল হৃদয়ে' নিয়ে গেলেন। সারিয়ে তুললেন। সুস্থ হয়ে ফিরে এল মন্দিরে। সেই পূজারী বন্ধুদের বললে, আমি সারা জীবন 'মা কালী'কে ভজনা করেছি। জীবন্ত কালীমা কে আজ নিজের চোখে দেখে এলাম। এই হল মাদার। মাদার টেরেসা সবার। তিনি মানুষের। মায়ের কাছে কোন জাত-পাত নেই। সব ছেলেই তাঁর কাছে সমান। তিনি শুধু হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের মা নয়। বিশ্ববাসীর মা। সবকিছুর উর্ধ্বে মা।

ছেচল্লিশের দাঙ্গা চলছে। কলকাতায় হাঁটছেন মা। কার্ফুতে সবাই যখন ঘরে। মা তখন বাইরে। ফুটপাথে একজন মুমূর্ষু মানুষ যন্ত্রণায় কাৎরাচ্ছে। কেউ তাকে দেখছে না। মাদার গেলেন, তুলে নিলেন তাকে। ভালোবাসার স্পর্শ পেলেন। অবশেষে সে থেকে চলে গেল। মারা যাবার সময় সেই মানুষটি বলে গেল। সারাজীবন আল্লাহকে ডেকেছেন কিন্তু পাননি। আজ সে জীবন্ত আল্লাহ্ এর স্পর্শ পেয়ে শান্তিতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। আম্মা তুঝে সেলাম।

১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ ১৭ অক্টোবর। সাংবাদিকরা ছুটে এলেন মাদার হাউসে।

জোড়াগীর্জার উল্টোদিকের মিশনারিজ অব চ্যারিটির ভবনে অসংখ্য মানুষের ভিড়। অনেকের হাতে ফুলের মালা। সেবা আর শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার। যার আর্থিক মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ৫০ লক্ষ টাকা। শুধু আর্থিক মান এর প্রাপ্য নয় বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান।

একজন সাংবাদিক প্রশ্ন করলেন।

—আপনি কি ভারতীয় ?

মুখে মধুর হাসি ছড়িয়ে উত্তর দিলেন মাদার —

— নিশ্চয়ই আমি ভারতীয় নাগরিক।
আমার পাশপোর্টও ইণ্ডিয়ান পাশপোর্ট।
(ইয়েস আই অ্যাম ইণ্ডিয়ান মাই চয়েজ।
ইউ আর অ্যন ইণ্ডিয়ান বাই অ্যাকসিডেন্ট।)

ভিড় উপচে পড়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অভিনন্দন আসছে। মাদার নিশ্চল। এতটুকু উত্তেজনা নেই। নেই কোন চাঞ্চল্য। শান্ত, করুণাময়ী মাতৃমূর্তি। মানুষের সেবার জন্য এই পুরস্কার।

– এ পুরস্কার কেমন লাগছে?

– ঈশ্বরের মহিমা আরও একবার প্রকাশ পেল।

শুধু নোবেল পুরস্কার নয়। তিনি বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেয়েছেন। যেন পুরস্কারের মালা। এত পুরস্কার সম্ভবত আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে আর কেউ পাননি। মাদারকে পুরস্কার দিয়েই দাতারাই ধন্য হয়েছেন।

মাদার গেলেন ইথিওপিয়ায়। এখানে কোন আশা নেই। সিস্টার অনেকদিন ধরে হতাশ হয়ে গেছেন। মাদার নির্ভীক যোদ্ধার মতো ইথিওপিয়ার সম্রাট হেইলে সেলাসির সঙ্গে দেখা করলেন।

— আপনি সরকারের কাছে কী চান ?

— কিছুই না। শুধু অসহায় মানুষের সেবা করতে চাই।

— আপনি খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতে চান ?

— আমরা ভালোবেসে কাজ করি। আমাদের সম্বল আন্তরিকতা। হৃদয়।

রাজি হলেন সম্রাট হেইলে সেলামি। শুরু ইথিওপিয়ায় মাদারের সেবাকাজ। মাদার কোন রাজ্য চাননি। কোন সম্মান চাননি। এমনকি মোক্ষও চাননি। পৃথিবীতে যারা নামহীন, গৃহহীন, বঞ্চিত মানুষের সেবাব্রত তাঁর।

একজন ভিখারি মাদারকে দান দিতে এসেছে। তিনি সেই দান নিলেন। ফিরিয়ে দিলেন না। আনন্দে সেই ভিখারি মাদার হাতে চুমু খেলেন। মাদারের কাছে এই ভিখারির দান— নোবেল পুরস্কারের চেয়েও বেশি।

আমেরিকা পৃথিবীর ধনী দেশ। অর্থ আর প্রাচুর্য আমেরিকার মানুষকে করেছে বাঁধনহারা। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রা তাদের ভয়ঙ্কর মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়েছে। তাদের গ্রাস করেছে এইডস্ নামক দুরারোগ্য। নাইট ক্লাব বন্ধ হল। হাসপাতালেও এইড্স

রোগীকে ভর্তি নিতে অসম্মত হল। এগিয়ে এলেন মাদার। সঙ্গে এলেন শতশত সিস্টার। সাদা শাড়ী নীল পাড় পরা শাড়ীর সন্ন্যাসিনীরা পরম আন্তরিকতায় সেবাব্রতে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

— মাদার পৃথিবীতে সবচেয়ে কঠিন ব্যধি কি ?

— পৃথিবীর সবচেয়ে সংকট ক্যান্সার বা এইডস নয়। আধুনিক পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সংকট ভালোবাসাহীন পৃথিবী। ভালোবাসাহীন মানুষ। অস্ত্র দিয়ে, অর্থ দিয়ে জয় করা যায় না। ধর্ম নয় সবচেয়ে বড় কর্মের নাম ভালোবাসা।

কলকাতার মাদার

<u>প্রকৃতিও কেঁদেছে</u>

স্মরণীয় ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ। ৫ সেপ্টেম্বর (২০ ভাদ্র) শিক্ষক দিবস। বিংশ শতাব্দীর এক মহান শিক্ষিকার জীবনাবসান হল। ৫ সেপ্টেম্বর রাত শেষ হয়ে সকাল হবার পর থেকেই বৃষ্টি শুরু হয়েছে। সমস্ত আকাশ কালো মেঘে ঢাকা। সারা দিন অঝরে বৃষ্টি পড়েছে। কলকাতাসহ বাংলার প্রকৃতি যেন নীরবে চোখের জল ফেলেছে। ঘন বর্ষাকে উপেক্ষা করেও হাজার হাজার মাদার ভক্ত মানুষের ভীড় উপচে পড়েছে। বিশ্বজননী মাদার টেরেসার মৃত্যুদিনও এক প্রতীকী ব্যঞ্জনায় চিহ্নিত হল। এ এক রিরল দিন। মানুষ এবং প্রকৃতি একই সঙ্গে গভীর শোকে নিমজ্জিত হল।

<u>ভারতীয় শাড়ী</u>

মিশনারি মাদার টেরেসাই প্রথম বিদেশী, যিনি ভারতীয় পোষাককেই মর্যাদা দিয়েছেন। নীল পাড়ের সাদা শাড়ী ছিল ভারতের মেথরাণীদের পোষাক। দরিদ্র ও প্রান্তজন মানুষের মর্যাদা দেবার জন্যই, এই শাড়ীকেই মনোনীত করেছিলেন তিনি। পৃথিবীর সব দেশে, যেখানে মাদারের আশ্রম আছে, সেখানে এই নীল পাড় সাদা শাড়ী আছে। নীল পাড় সাদা শাড়ী দেখলেই বোঝা যায় 'মিশনারিজ অফ্ চ্যারিটি'র সন্ন্যাসিনী সিস্টারদের। সেবাব্রতী ভারতীয় শাড়ী! যাঁরা এই শাড়ী পরেই সমাজের জঞ্জাল সাফ্ করেন, তাঁদের কে মান্যতা দিতেই মাদারের এই পরিকল্পনা। মাদার টেরেসা ভারতীয় নাগরিক। ভারতীয় শাড়ীর মাধ্যমেই মাদার সারা বিশ্বে ভারতের ত্যাগের ব্রতকেই ছড়িয়ে দিলেন। নানের দামী পোষাক ছেড়ে দলিত নারীর শাড়ীকেই গ্রহণ করলেন মাদার।

<u>সম্প্রীতি 'মা'</u>

কালীঘাটের পূজারী ব্রাহ্মণেরা দাবী করেছেন, মাদার, জীবন্ত কালী মাতা। আবার মহম্মদ আশফাক্ দাবী তুলেছেন— মাদার মুসলমান পীর। আশফাক্ মনে প্রাণে বিশ্বাস করেন, একমাত্র মুসলিম পীরদের কাছেই এত মহান সেবা করা সম্ভব। ইসলামের মূল মন্ত্রই হচ্ছে দরিদ্রকে সেবা করা। মাদার টেরেসা ইসলামের আদর্শকেই সারা জীবন পালন করেছেন। হতে পারেন মাদার টেরেসা খ্রিস্টপ্রেমিক, আশফাক্ মুসলিম। কিন্তু ধর্মই জীবনের সব নয়। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির সেতু বন্ধন ঘটিয়েছেন, ঘটিয়েছেন মাদার টেরেসা। মা যে সবার। সবার উপরে মা।

মাদার টেরেসা সরণি

মাদারের মৃত্যুর পরের দিনই মধ্যপ্রদেশের একটি রাস্তার নামকরণ হয়েছে মাদারের নামে। মাদার স্মরণে এক বিশেষ প্রার্থনা সভায় শ্রদ্ধা জানাতে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী দিগ্বীজয় সিংহ এই ঘোষণা করেন। মধ্যপ্রদেশের রাজভবন থেকে জেল ভবন পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম মাদার টেরেসা সরণি। আর কলকাতাও মাদারের নামে রাস্তার নামকরণ করে, কলকাতার সংস্কৃতিতে মাদার টেরেসা স্মরণীয় হয়ে থাকলো। কলকাতার পার্কস্ট্রিটের বর্তমান মাদার টেরেসা সরণি। ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মাদারের নামে গড়ে উঠেছে হাসপাতাল, ভালোবাসার সেবাকেন্দ্র।

কালীঘাটে মাদার

দক্ষিণ কলকাতার রাসবিহারী বসু মোড়ে আসুন। উপরের দিকে চোখ রাখুন— দেখতে পাবেন মাদারের দীর্ঘ মিউরাল। কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে মাদার টেরেসার অপরূপ পাথর-খোচিত মিউরাল। সমন্বয় সংস্কৃতির কলকাতার ঐতিহ্যকে দৃষ্টি নন্দিত করছে মাদারের এই মায়াময় মূর্তিটিতে। দূর থেকে পথচলতি মানুষ করুণাঘন মায়ের ছবি দেখে মুগ্ধ হয়ে মাথা নত করেন। শুধু তাই নয়, কালীঘাটের মেট্রো স্টেশনের মধ্যেও মাদারের 'নির্মল হৃদয়ের' সেবাযজ্ঞের চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে। আর পার্কস্ট্রিট মেট্রোতেও সেই মায়ের ছবি। কলকাতা মাকে ভোলেনি; ভুলতে পারে না।

অবিস্মরণীয় অন্ত্যেষ্টি

১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৩ সেপ্টেম্বর, ভারত সরকার রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পালন করলো মাদারের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠান। বিশ্বের ১২০ দেশের রাষ্ট্রনায়ক ও প্রতিনিধিরা মাদারকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে আসেন কলকাতার ইণ্ডোর স্টেডিয়ামে। যাঁর কাজ শুরু মোতিঝিল বস্তিতে, তাঁর শেষ যাত্রায় রাজকীয় সম্মান। বিশ্বের সেবাব্রতের ইতিবৃত্তে অনাথ জননীকে বিশ্বের বরেণ্য সন্তানেরা বাৎসল্যের বিনিময়ে প্রতিবাৎসল্য উজাড় করে দিয়েছে।

ফুলের মেলায়

কলকাতার লরেটো কলেজের কাছে সেন্ট থমাস চার্চ। এখানে মাদারের মরদেহ শায়িত আছে। গির্জা প্রাঙ্গণে বসে গিয়েছিল মনোরম ফুলের মেলা। হাজার হাজার মানুষের হাতে ফুলের গুচ্ছ। সেদিন পার্কস্ট্রিটে সপ্তাহব্যাপী (৫-১২ সেপ্টেম্বর ১৯৯৭) স্বতঃস্ফূর্ত ফুলের হাট শুরু হয়েছিল। যারা খালি হাতে এসেছিল তারাও মাদারের শ্রদ্ধাঞ্জলির ফুলগুচ্ছ পেলো। ফুলের পাহাড় দেখে জনৈক বুদ্ধিজীবী মন্তব্য করেছিলেন— ফুল, মোমবাতি আর ধূপের অর্থ 'দান বাক্সে' সংগৃহীত অর্থে মাদারের সেবাকাজ আরও একটু এগিয়ে যেতে পারতো।

ভারতের সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে বাংলার বীরাঙ্গনাদের কথা ইতিহাসের একটি অবহেলিত অধ্যায়

তনুশ্রী বিশ্বাস

"মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন
হয়েছেন প্রাতঃ স্মরণীয়
সেই পথ লক্ষ্য করে স্বীয়কীর্তি ধ্বজা ধরে
আমরাও হবো বরণীয়।"

এ আশা মনে না গেথেও যে বীরাঙ্গনা নারীরা দেশের কল্যাণার্থে, স্বাধীনতাসংগ্রামে সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে আপসহীন লড়াই করে, দেশমাতার পূজাবেদীমূলে নিজেদের উৎসর্গ করে গেছেন— যাঁদের জীবনপ্রদীপ সভ্যতার অনির্বাণ অগ্নিশিখাকে প্রজ্জ্বলিত রাখতে সমিধ হিসাবে কাজ করেছে, যাঁদের অস্তিত্বের একটাই অর্থ- 'কতদিন বাঁচলাম এটা বড় কথা নয়, কেন বাঁচলাম, কাদের জন্য বাঁচলাম, এটাই আসল কথা'— আজ তাদের কথাই এ প্রবন্ধে আলোচ্য।

আজকের জাতীয় জীবনে নেমে এসেছে এক নৈতিক অধঃপতন এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়। এই জাতীয় সংকটের আঁচ পেয়েই কবি জীবনানন্দ বলেছিলেনঃ "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে পৃথিবীতে আজ" আজকের কিশলয় আগামীদিনে জাতির ভবিষ্যৎ মেরুদণ্ড, জাতীয় উন্নতির অগ্রদূত। বাইরের ঐশ্বর্যসম্ভার বা বিওসম্পদের দ্বারাই জাতি শুধু বড়ো হয়না, বড়ো হয় তার অন্তরের শক্তিতে, নৈতিক চেতনায়, আর জীবনপণ করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর ক্ষমতায়। আজকের প্রজন্মের কাছে স্বাধীনতা স্বতঃসিদ্ধ আবিষ্কার। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময় থেকে প্রাক্-স্বাধীনতা কালে দেশের মানুষের কাছে একটি বড় লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। যাঁদের ত্যাগ-তিতিক্ষায়, আত্মবলিদানের মাধ্যমে এসেছে কষ্টার্জিত স্বাধীনতা, তাদের দেশাত্মবোধ সাহসিকতার কথা, বিশেষত বীরাঙ্গনা বীরললনা-যাদের হৃদয়ে বহ্নিমান ছিল বিদ্রোহের বারুদ, তাদের জীবনের নিখুঁত জলছবি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরলে তারা অভীমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সত্য ও সঠিক পথের অনুসারী হবে এই আশায়—

"বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা
যেন ধরার ধূলায় হয় নাকো হারা।"

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সুদীর্ঘ ইতিহাসে যে'কটি প্রদেশ আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে, বাংলা অর্থাৎ অবিভক্ত বঙ্গপ্রদেশ তার মধ্যে অন্যতম। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধে মূলত দুটি ধারা কার্যকর ছিল, একটি হল অহিংস আন্দোলন, অপরটি হল সশস্ত্র সংগ্রাম। বাংলার নারীসমাজ বিভিন্ন ধারার সংগ্রামের সাথে যুক্ত থেকে অসম সাহসিকতার সঙ্গে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে নারীসমাজের সার্বিক অংশগ্রহণের পটভূমিতে আছে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সামাজিক গতিপ্রবাহ- যা নারীদের অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে বহির্বিশ্বের মুক্ত আঙিনায় প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দিয়েছিল। নবজাগরণের যে ধারা বাঙালি সমাজের চিন্তা চেতনা ও মননকে প্রভাবিত করেছিল তারই ফলশ্রুতিতে বঙ্গনারীদের আত্মিকস্ফূরণ ত্বরান্বিত হয়। শিল্প, সাহিত্য ও শিক্ষার অঙ্গন জুড়ে বঙ্গললনাদের সাবলীল পদচারণা তাঁদের আত্মবিকাশের পথকে আরও সুগম করে তুলেছিল। এরই পাশাপাশি বাংলার মাটিতে স্বাদেশিকতার অঙ্কুরিত মুকুলের ফল আহরণ করেছে রঙ্গরমণীকুল।

"মরিব তোমারি কাজে, বাঁচিব তোমারি তরে
নহিলে বিষাদময় এ জীবন কে বা ধরে?"
— কামিনী রায় 'মা আমার'

দেশের স্বাধীনতার জন্য এই আন্তরিক ব্যাকুলতায় যে সব মহীয়সী সশস্ত্র বিপ্লবী নারী নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন দেশের জন্য, ছেড়েছিলেন ঘর-সংসার, তাঁদের অনেকেই পরবর্তীকালে ছবি হয়েও দেওয়ালে স্থান পাননি। স্বাধীন ভারতের অনেক নেতৃত্ব পর্যন্ত জানেননা ভারতের মুক্তিমন্ত্রে কোন কোন দেশপ্রেমিকা ব্রিটিশ প্রশাসনকে ভারতবর্ষের মাটি থেকে অপসারিত করতে সমাজসংস্কার ও ভবিষ্যতের স্বপ্ন বিসর্জন দিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে লড়াই করেছিলেন জীবনের মায়া ত্যাগ করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে দেশের স্বাধীনতার জন্য এইসব নারীদের শিখতে হয়েছিল লাঠিখেলা, ছোরাখেলা এবং আগ্নেয়াস্ত্র চালানো। তাঁদের জানতে হয়েছিল বোমা বানানো, বোমা নিক্ষেপ করা এবং গুপ্তভাবে ছদ্মবেশে বিপ্লবীদলের নেতৃত্বের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকরার কায়দা-কানুন।

নারীবিপ্লবীদের গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব পরবর্তী পরিকল্পনা ঠিক করতেন। বিপ্লবীদলের সংগ্রহকরা বহু গুপ্ত অস্ত্র নারী বিপ্লবীদের হেফাজতে রাখা হতো। নারীবিপ্লবীদের আগাম খবরের ভিত্তিতে বিপ্লবীনেতৃত্ব গ্রেপ্তার এড়াতে পেরেছিলেন, ইংরেজ প্রশাসন জানতে পারলে ঘোরতর বিপদ নেমে আসবে বুঝেও বাংলার সাধারণ ঘরের বহুনারী সশস্ত্র বিপ্লবীদের প্রয়োজনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, যাদের নামে চিরকাল হয়তো চাপা পড়েই থাকবে। স্বাধীনতা আন্দোলনে বহুশিক্ষিত পরিবার হারিয়েছিলেন তাদের বাড়ির অগ্নিদীপ্ত মেয়েকে। বহুপরিবারের মা-বউরা পুলিশের অত্যাচার সহ্য করেও ব্রিটিশ প্রশাসনের কাছে মুখ খোলেনি। বিপ্লবীদের ডেরার সন্ধান তাদের কাছ থেকে বের করতে পারেনি ব্রিটিশ প্রশাসনের পুলিশ।

কিছু কিছু লেখক প্রসঙ্গক্রমে বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের নিয়ে কিছু কিছু কথা লিখলেও সশস্ত্র নারী বিপ্লবীদের নিয়ে পূর্ণ ইতিহাস আজও তৈরি হয়নি। অথচ এই বীরাঙ্গনা, অগ্নিকন্যাদের হৃদয়েই ধ্বনিত হত —

"নারীর জীবনে নাই প্রয়োজন
স্বাধীনতা হেন মুখের কথা
বলেছিল সেগো কোন্ মহাজন?
বুঝেছিল সেকি নারীর ব্যথা?
নারী কি মায়ার ছলনামূর্ত্তি?
নারী কি কেবল নরের ভোগ্য
নহে কি জননী, নহে কি ভগিনী
নহে কি বিশ্বহিতের যোগ্য?"
— হেমলতাদেবী 'মেয়েদের কথা'

১৯০৫ সাল, ১৬ ই অক্টোবর তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জনের এক কলমের খোঁচায় গোটা বাংলাকে কেটে দু'ভাগ করা হলো। বিদ্রোহ বিপ্লবেরই পূর্বগামী, বিদ্রোহ ব্যতীত বিপ্লব ঘটেনা, বিপ্লবের মধ্যেই বিদ্রোহের পদসঞ্চার। ইংরেজ শাসকের দমননীতির তীব্রতার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী কার্যকলাপও দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে। ভবিষ্যতে বড় ধরনের ব্যাপক রক্তক্ষয়ী আন্দোলনের ভয়ে মর্লে-মিন্টো শাসন সংস্কার প্রবর্তনসহ ১৯১১ সালে স্বয়ং সম্রাট পঞ্চমজর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ বা রোহিত করেন। উদ্দীপিত স্বাধীনতার অত্যুগ্রবাসনায় মুক্তিকামী মানুষের এই চিরায়ত স্বাধীনতাস্পৃহায় কবিকণ্ঠে নিনাদিত হয় :

"বাংলার মাটি দুর্জয় ঘাটি, দেখে যাক দুর্বৃত্ত"

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের গর্ভেই জন্মলাভ করে বাংলার সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। যদিও এর বীজবপন হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূচনা পর্ব থেকেই। আমলাতন্ত্রের প্রত্যাশা ছিল; সব প্রতিবাদই অল্পদিনের মধ্যে থেমে যাবে এবং সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদনের বাধা সড়ক কখনোই ছাড়বে না। সেই প্রত্যাশাকে সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে জুলাই ১৯০৫ এর পর চমকপ্রদ দ্রুততায় আন্দোলন তার প্রথাগত নোঙর ছিঁড়ে বেরিয়ে এল, গড়ে তুলল নানান ধরনের নতুন ও জঙ্গীকৌশল, টেনে আনল আগের চেয়ে আরও অনেকবেশি মানুষকে এবং ছড়িয়ে পড়ল স্বরাজের সংগ্রামে।

শিরোমণিকেন্দ্রিক সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ডাক —

"প্রতিটি জেলায় ক'জন ইংরেজ কর্মচারী আছে? দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তোমরা একদিনেই ইংরেজশাসন শেষ করে দিতে পার। ......রক্তছাড়া দেশ কী জাগবে?" ('যুগান্তর' ৩ মার্চ, ২৬ আগষ্ট ১৯০৭)

বিপ্লবী পুলিনবিহারী দাসের নেতৃত্বে ১৯০৬-০৭ সালে ৫০ নম্বর বাড়ি, উয়াড়িতে

ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ঢাকায় এর শাখা গড়ে ওঠে অন্তত ৫০০
টি। আপাতদৃষ্টিতে ব্যায়াম, ছোরা খেলা, লাঠিখেলা বা শারীরিক শান্তি প্রদর্শনীর আখড়া
বলে পরিচিত হলেও আসলে সেগুলি ছিল বিপ্লবীদের গুপ্ত কার্যালয়। জাতীয়তাবাদের
অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে উদ্দীপ্ত করা হতো যুবসমাজকে। ব্যাঙ্ক ও রেল ডাকাতি, উচ্চপদস্থ
রাজকর্মচারীদের গুপ্ত হত্যা এইসব পরিকল্পনা ওখান থেকে নেওয়া হতো। ব্রিটিশ
সরকারের রাজরোষে পড়ে অনুশীলন সমিতি ১৯০৯ সালে বেআইনী ঘোষিত হয়।

১৯০৬ সালে 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয় কলকাতা থেকে। যুগান্তর
গোষ্ঠীও বিপ্লবীদল গড়ে তোলে। এই পত্রিকায় বিপ্লবী যুবকদের মনোভাবকে দৃঢ় করার
জন্য লেখা হয়- "শ্বেতজাতির হাত থেকে স্বাধীনতা অর্জনের সংকল্প আমরা ছাড়ব
না—টাকার ভাবনা নেই। পোস্ট অফিস; ব্যাঙ্ক, ট্রেজারি লুট করে যথেষ্ট টাকা পাওয়া
যাবে, টাকা হলেই পিস্তল, রিভলবার পাওয়া যাবে। বোমাও তৈরি করা যায়। যুবকগণ
দেশমাতৃকার পূজায় আত্মবলিদানে বদ্ধপরিকর হও।"

সব বিপ্লবী দলই বিশ্বাস করতেন রক্তের বিনিময় ছাড়া প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন
করা যায় না। অনুশীলন সমিতি ও যুগান্তর এই দুটি বিপ্লবী দলে তরুণ যুবকরাই
অংশগ্রহণ করতেন, প্রাথমিকভাবে নানা কারণ-বশতঃ মেয়েদের এই দলে যুক্ত করা
হতো না। এ প্রসঙ্গে সতীশ পাকড়াশি তাঁর 'অগ্নিদিনের কথা'য় লিখেছেন,—
"মেয়েদের রাজনৈতিক শিক্ষা এবং সামাজিক অধিকার না থাকায় তাদের দলে আনার
কোনো পরিকল্পনা তখন ছিল না।"

১৯০৫ থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীদলগুলি
বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। পরাধীন ভারতবর্ষে সশস্ত্র বিপ্লবীকণ্ঠে আওয়াজ উঠেছিল —

'ইংরেজ তুমি ভারত ছাড়, অন্যথায় ইংরেজ খতম কর।'

মানসিক জোর ও তেজস্বিতা থাকলে ভারতীয় নারীও যে অগ্নিকন্যা হয়ে উঠতে
পারে তা বোধহয় দ্ব্যর্থহীনভাষায় স্বামী বিবেকান্দের মতো করে আর কেউ বলেননি।

রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নারীসমস্যা নিয়ে এগিয়ে এলেও নারীদের
বিপ্লবে যোগ দেওয়ার কথা বলেননি। সমাজ সচেতন মহামনীষীরা কখনই ভাবতে
পারেননি ভারতীয় যুবতী স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবীদলে যোগ দিয়ে দেশ
থেকে ইংরেজ তাড়াতে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র তুলে নিতে পারেন। সশস্ত্র বিপ্লবীদলের নেতৃত্ব
কিন্তু নারী শক্তিকে ছোট করে দেখেননি। তাঁরা যাচাই করে দেশের জন্য অর্পিত
যুবতীদের ওপর দিয়েছিলেন গুরু দায়িত্ব।

'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় —

রাশিয়ার 'নিহিলিস্ট' এবং ইংল্যাণ্ডের 'সাফ্রেজিস্ট' মেয়েদের আবির্ভাব হয়েছে
বাংলার মাটিতে। বাঙালি মেয়েরাই ইংরেজদের সবচেয়ে দুর্ধর্য ও দুর্দমনীয় শত্রু।

বাংলার মেয়েদের এই জাগরণে উদ্দীপ্ত হয়েই চারণ কবি মুকুন্দদাস গেয়েছিলেন—

'ভয় কি মরণে রাখিতে সন্তানে
মাতঙ্গী মেতেছে আজ
সমর রঙ্গে।'

— দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের আবেদন ছিল—

'না জাগিলে সব-ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা, জাগেনা।'

সশস্ত্র নারী বিপ্লবীরা ছিলেন দলের রত্নবিশেষ। সিউড়ির (বীরভূম) সিন্ধুবালা দেবী,
প্রকৃত নাম দুকড়িবালা দেবী পরাধীন ভারতের প্রথম মহিলা বিপ্লবী ছিলেন। তিনি
বেআইনী বই লুকিয়ে পড়ার জন্য তার বাড়ীতেই সমস্ত ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি
বুঝেছিলেন সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে এইসব বে-আইনি ঘোষিত বইগুলি না পড়তে পারলে
ভারতের যুবক-যুবতীরা নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি করতে পারবেনা।

তদানীন্তনকালের বিপ্লবীনেতা জ্যোতিষ ঘোষ, ফেরারী বিপ্লবী নেতা বিপিন বিহারী
গঙ্গুলীরা সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী বিপ্লবীদলের সদস্য জোগাড় করতেন দু'কড়িবালা
দেবীর সহায়তায়।

বোনপো সশস্ত্র বিপ্লবী নিবারণ ঘটক মাসীমার বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন
সাতটি মসার পিস্তল নিয়ে। মাসীমাকে পিস্তলগুলি দিয়ে অনুরোধ করেছিলেন পুলিশ
যেন জানতে না পারে মসার পিস্তলগুলির কথা ও লুকিয়ে রাখার স্থান। পুলিশ জানলে
ভীষণ বিপদ, গ্রেপ্তার হতে হবে দু'কড়িবালাকে। ১৯১৭ সাল, বাড়ি ঘিরে ফেলে
পুলিশবাহিনী। তল্লাসীতে পাওয়া যায় সাতটি মসার পিস্তল।

অকথ্য অত্যাচার হ'ল তার ওপর সোর্স জানার জন্য। একটি কথাও বের করা
গেলনা দু'কড়িবালার মুখ থেকে। দু'কড়িবালার কোলে তখন দুধের শিশু। শিশুটিকে
বাড়িতে ফেলে রেখে, থানায় নিয়ে এসে গ্রেপ্তার করা হল দু'কড়িবালা দেবীকে।
দেশদ্রোহিতার অভিযোগে বিচার শুরু হল স্পেশাল ট্রাইবুনালে। দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড
দিয়েও ব্রিটিশ সরকার ক্ষান্ত হলনা, প্রতিদিন জেলে তাঁকে আধমন ডাল ভাঙতে হতো।
১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পান গ্রাম্যবধূ দু'কড়িবালা দেবী। মৃত্যু হয় ১৯৭০
সালে।

হাওড়ার সূর্যকান্ত ব্যানার্জির বাল্যবিধবা কন্যা ননীবালা ভারতজার্মান বিপ্লবী
ষড়যন্ত্রে যুক্ত হয়ে ধরা পড়েন সুদূর পেশোয়ায়। বিপ্লবী অমরেন্দ্র চ্যাটার্জির কাছে।
তিনি বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বাংলা দেশের প্রথম মহিলা স্টেট প্রিজনার তিনি।
পলাতক অমর চ্যাটার্জি ও তাঁর বিপ্লবী সহকর্মীকে রিষড়ায় দু'মাস আশ্রয়দান করেন।
বিপ্লবী রামচন্দ্র মজুমদার গ্রেফতার হয়ে জেলে চলে গেলে, লুকানো পিস্তলের কথা
জানার জন্য পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে রামবাবুর স্ত্রী সেজে গুপ্ত কথা জেনে এসে,
তার লুকিয়ে রেখে যাওয়া পিস্তলটা তুলে দিয়েছিলেন সহকর্মীদের হাতে। তারপরই
শুরু হয় অকথ্য নির্যাতন। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য সেদিন 'সু-সভ্য' ইংরেজ
সরকারের পুলিশ এই নিষ্ঠাবতী বিধবা মহিলাকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা করে তাঁর দেহের
অভ্যন্তরে লঙ্কাবাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। পুলিশের অকথ্য অত্যাচারেও তিনি কোনো
কথা প্রকাশ করেননি। প্রেসিডেন্সি জেলে থাকাকালীন উনিশদিন অনশন করেন। তিনিই

প্রথম বাঙালি মহিলা যিনি ১৮১৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন আইনে রাজবন্দী হিসাবে কারাগারে আটক ছিলেন।

ময়মনসিংহের ক্ষীরোদা সুন্দরী চৌধুরীও প্রায় একবছর ধরে গৃহকর্ত্রীর বেশে নানা জায়গায় যুগান্তর দলের বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালের জুন মাসে কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের ডেপুটি সুপার বসন্ত চ্যাটার্জিকে হত্যার দায়ে বিপ্লবী সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ও ক্ষীতিশ চৌধুরীর জ্যেঠিমা ক্ষীরোদা সুন্দরী বিপ্লবীদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে ময়মনসিংহের ভাড়াবাড়ি নিয়ে তাদের আশ্রয় দিলেন। কিছুদিন পরে সেই আশ্রয়ে এলেন যদুগোপাল মুখার্জি ও নলিনীকান্ত কর। এরপর নারায়ণগঞ্জ, জামালপুর, সিরাজগঞ্জ, ধুবড়ি বিভিন্ন জায়গায় বিপ্লবীরা গৃহকর্ত্রী হিসাবে ক্ষীরোদা সুন্দরীকে নিয়ে থেকেছেন। পরে নিরাপত্তার কারণে ক্ষীরোদা সুন্দরীকে প্রথমে কাশী ও পরে বাপের বাড়ি ময়মনসিংহের খারুয়াগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশ প্রথমে তাঁকে সন্দেহ করলেও ধরতে পরেনি—কারণ কাশী থাকাকালীন তিনি ওই বাড়িতে তাঁর নাম ঠিকানা লিখে রেখে আসার ফলে তাঁর কাশীর অবস্থান নিয়ে পুলিশের সন্দেহ করার অবকাশ না থাকায় গ্রেফতারি এড়াতে সক্ষম হন।

মতিপ্রভা দত্তগুপ্ত ১৯১৮ সালে মাত্র ৮ বছর বয়সে পুলিন বিহারী বসু মারফৎ অনুশীলন দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৫ বছর বয়সে শপথ নিয়ে দলের সদস্যা হন। বিখ্যাত শোভাবাজার মামলায় স্বামী স্ত্রী দু'জনেই গ্রেফতার হন। পরবর্তীতে তিনি মাস্টারদা সূর্যসেনের সংস্পর্শে এসে চট্টল বিদ্রোহে যোগদান করেন।

১৯১৬ সাল নাগাদ গ্রামবাংলার আর একজন মহিলা দুঃখময়ী যাঁর নাম, তিনি বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও চিঠিপত্রের আদান প্রদান করতেন। এই কারণে পুলিশ তাকে অভিযুক্ত করে ও অত্যাচার করে। বিপ্লবীদের আশ্রয়দান ও অস্ত্র সংরক্ষণের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বগলাসুন্দরী দেবী, বিন্দুবাসিনী দেবী, বরিশালের দুর্গা পাইন প্রমুখ।

সঞ্জীবনী পত্রিকার সম্পাদক ব্রাহ্মনেতা শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্রের স্ত্রী লীলাবতী মিত্র এবং তাঁদের কন্যা যাঁর নাম এর আগেই উল্লেখিত হয়েছে 'সুপ্রভাত' পত্রিকার সম্পাদিকা হিসাবে, তাঁরা সক্রিয়ভাবে বিপ্লবী কার্যকলাপে বিশ্বাসী ছিলেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পরবর্তী জীবনে যিনি স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন, তাঁর বিধবা ভগিনী সরোজিনী দেবী বরিশালে বৈপ্লবিক প্রচার কাজে অংশগ্রহণ করেছেন। তেমনি বিপ্লবী বাঘা যতীন যিনি যুগান্তর দলের সদস্য ছিলেন তাঁর দিদি বিনোদিনী দেবীও বিপ্লবী কাজের সমর্থক ছিলেন।

অনুশীলন দলের নেতা জীবন হালদারের মা রাধারানী দেবীও ছিলেন বিপ্লবী দলের সমর্থক।

চারুশীলা গোস্বামী ছিলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ছাত্রী। পিতৃমাতৃহীন অগ্নি বালক ক্ষুদিরামের সাহচর্যে এসে বিপ্লবী কাজে আকৃষ্ট হন। ক্ষুদিরাম তাঁকে রক্ততিলক পরিয়ে বিপ্লবী স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হবার প্রতিজ্ঞা করিয়েছিলেন। ১৯০৮ সালে কিংস

ফোর্ডকে হত্যা করতে যাওয়ার আগে ক্ষুদিরাম কিছুদিন চারুশীলা দেবীর বাড়িতে বাস করেন। ক্ষুদিরামের মামলা চলার সময় পুলিশ চারুশীলা দেবীর খোঁজ করতে শুরু করলে তিনি আত্মগোপনে চলে যান।

ইন্দুমতী দেবীর পিতা নীলমাধব ঘটক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দেওয়ান ছিলেন। মাতামহের কাছে লালিত পালিত ইন্দুমতী দেবী বিপ্লবীদলের সদস্যদের গোপনে আশ্রয়দান ও সাহায্য করেছেন নানাভাবে। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী তাঁর দেওর হেমন্ত চট্টোপাধ্যায়ও তাঁকে বিপ্লবীদলের কাজে উৎসাহিত করেছিলেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে সুভাষের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স'। সুদক্ষ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর চাই যথাযোগ্য শৃঙ্খলাবোধ। সামরিক রীতিনীতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ স্বেচ্ছাসেবকদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে, পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে এসেছিলেন দঃকলকাতা শাখার দুর্ধর্ষ নায়ক মেজর সত্যগুপ্ত। মেয়েরাও পিছিয়ে ছিলনা, কর্ণেল লতিকা বসুর নেতৃত্বে সবাই এসে জড়ো হয়েছিলেন একে একে, ক্ষণে ক্ষণে উঠেছিল বজ্রহুঙ্কার — লেফ্‌ট রাইট, লেফ্‌ট রাইট...

আজ দিন-কাল পাল্টেছে। বদলে যাওয়া সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলেছে কর্মব্যস্ত জীবনের ধারা ও রূপ, কিন্তু সেদিন মেয়েদের পক্ষে প্রচলিত বিধিনিষেধের বাইরে পা বাড়ানো খুব একটা সহজ ছিলনা।

গান্ধীবাদী আদর্শে বিশ্বাসী কমলা দাশগুপ্ত মাত্র ১২ বছর বয়সে এই বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা হন। ১৯০৭ সালের ১১ই মার্চ ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ১৯২৯ সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের ছাত্রী ছিলেন। এইসময় থেকেই তাঁর মনে বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠেছিল। পড়াচলাকালীন মেয়েদের হস্টেলে বোমার ঝুড়ি লুকিয়ে রাখতেন, গোপনে পাচার করতেন বোমা, পিস্তল, চিঠিপত্র। কমলা দাশগুপ্তর লেখা দুটি বই 'রক্তের অক্ষরে' এবং 'স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলার নারী ইতিহাস' প্রামাণ্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। ১৯৩০ সালে তিনি ডালহৌসি বোমা মামলায় গ্রেফতার হলেও প্রমাণাভাবে ছাড়া পেয়ে যান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন হলে গুলি করে স্যার স্ট্যানলে জাকসনকে হত্যা করার পরিকল্পনায় বীণাদাসের সাথে কমলাও গিয়েছিলেন কনভোকেশন হলে। প্রমাণাভাবে কমলাদেবী এবারও ছাড়া পেয়ে যান। ১৯৩৩ সালে কমলা দাশগুপ্তকে আবার গ্রেপ্তার করা হল দেশদ্রোহিতার অভিযোগে। তাঁকে প্রথমে প্রেসিডেন্সী জেলে, পরে হিজলী বন্দী নিবাসে আটক করে রাখা হয়েছিল। 'ভারতছাড়ো আন্দোলনে' যোগ দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। আবারও তাঁকে যেতে হয়েছিল প্রেসিডেন্সী জেলে। পরবর্তীকালে তিনি সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যা উজ্জ্বলারক্ষিত রায় বিপ্লবী আন্দোলনের একটি উজ্জ্বল নাম। ছাত্রী জীবনেই তাঁর গৃহশিক্ষক মধুসূদন ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় তিনি বিপ্লবী দলের কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবীদলের সঙ্কটকালীন পরিস্থিতিতে

যোগাযোগরক্ষা, ঘাঁটি সুরক্ষিত রাখার জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কোথা থেকে আসবে এতটাকা? দুঃশ্চিন্তাগ্রস্ত বিনয়বাবু দলের মেয়েদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য হাজির হয়েছিলেন বিপ্লবী নায়িকা উজ্জ্বলা মজুমদারের কাছে। উজ্জ্বলা মজুমদার শোনামাত্রই তৎপর হয়ে উঠেছিলেন সুবোলা সেন, উষা সেন প্রমুখ দলের অন্যান্য নারীকর্মীদের নিয়ে। টাকা চাই!! অনেকটাকা! পাওয়া গেল বেশকিছু অলঙ্কার, নারীর সবচাইতে প্রিয় সেই অলঙ্কারগুলোই তারা স্বেচ্ছায় তুলে দিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের এই দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাকে সুগম করে তুলতে। দার্জিলিং-এর লেবং রেসকোর্স মাঠে বাংলার গভর্নর আণ্ডারসন হত্যা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি গ্রেফ্‌তার হন ১৯৩৪ এর ১৮ মে। যদিও আণ্ডারসনকে হত্যা করা সম্ভব হয়নি। দার্জিলিংয়ে আনা বিপ্লবীদের অস্ত্রের বেশিরভাগই ছিল উজ্জ্বলার হেফাজতে। এই হত্যা মামলার ষড়যন্ত্রের দুই আসামী ভবানী ভট্টাচার্য ও রবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং মনোরঞ্জন ব্যানার্জি এবং উজ্জ্বলাকে ১৪ বছর যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। মহাত্মা গান্ধীর প্রয়াসে ১৯৩৯ সালে তিনি মুক্তি পান।

প্রখ্যাত বিপ্লবী অমরেন্দ্রনাথ সেনের বোন ছিল উমা সেন (দাশগুপ্ত)। কিশোর পত্রিকা 'রেণু' উমার মনে তরঙ্গ তুলেছিল। বিপ্লবী আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি দলের কাজে যোগ দেন। ১৯৩৩ সালে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট হত্যা মামলায় তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগের প্রমাণ না মিললেও রাজরোষে তাঁর পিতার চাকরি চলে যায়। ১৯৩৪ সালে পলাতক বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদারকে আশ্রয় দেবার কারণে বাবা, মা এমনকি বৃদ্ধা দিদিমাকেও হাজতবাস করতে হয়। বিপ্লবী দলের খবর আদান প্রদান, দলের অর্থসংগ্রহ করতেন তিনি।

শোভারানী দত্ত বিপ্লবের অনুপ্রেরণা পান পাঞ্জাব কেশরী লালা লাজপত রায়ের কাছে। তিনি ছিলেন যুগান্তর দলের কর্মী। বিপ্লবী কর্মীদের আশ্রয় দিতেন ও নানাভাবে সাহায্য করতেন। এই কারণে বহুবার তাঁকে গ্রেফতার বরণও করতে হয়েছে। ওনার বাড়ি থেকেই ১৯৩৪-এর ১৮ মে পলাতক বিপ্লবী উজ্জ্বলা মজুমদার গ্রেফতার হন এবং তাঁকেও পুলিশ গ্রেফতার করে। প্রেসিডেন্সী জেলে থাকার সময় এক জমাদারনী মাথায় ভারী তালা দিয়ে আঘাত করলে উন্মাদ হয়ে যান। এক বছর মানসিক হাসপাতালে চিকিৎসার পর সুস্থ হন। আনন্দমঠ, নারী সত্যাগ্রহ সমিতির কর্মী হিসাবেও তিনি কারাবরণ করেছেন। ডালহৌসি বোমা মামলাতেও তিনি গ্রেফতার হয়েছিলেন।

কমলা মুখোপাধ্যায়ের বাবা ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্লবী প্রমথনাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাদা বিপ্লবী কাজে যুক্ত থাকার কারণে পুলিশের নির্মম অত্যাচারে মারা যান। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই ব্রিটিশ বিরোধী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান করেন কমলা। ১৯৩১ সালে স্টিভেন্স হত্যা মামলায় অনেক মহিলা কর্মী গ্রেফতার হন। কমলা চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতমা। প্রথমে সিউড়ি জেলে ও পরে কুখ্যাত হিজলি জেলে বন্দী হিসাবে ছিলেন। ১৯৩৮ সালের প্রথমদিকে মুক্তি পান।

কল্যানী এবং বীণা বিপ্লবী আন্দোলনের স্মরণীয় দুটি নাম। এই দুই বোন নিজেদের

উৎসর্গ করেছিলেন দেশমাতৃকার সেবায়। পিতা বেণীমাধব দাস ছিলেন একজন আদর্শবান শিক্ষক। মাতৃভূমির পরাধীনতা তাঁকে কষ্ট দিত। নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুও ছিলেন বেণীমাধব দাসের ছাত্র। বীণাদেবীর মা ছিলেন একজন সক্রিয়সমাজসেবী। বীণা তাঁর দেশপ্রেম, আদর্শ ও চিন্তাভাবনা পেয়েছিলেন বাবা মায়ের কাছে। কল্যাণী দাস ছিলেন বীণা দাসের বড় বোন। দিদির সাহসী মনোভাব দেখে বীণাদেবী সশস্ত্র বিপ্লবী কাজে প্রেরণা পেয়েছিলেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল। সেইসময় বীণাদাস ছিলেন ছাত্রী। ছাত্রাবস্থায়ই তিনি বিক্ষোভ আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। আবার বীণা দাস কমলা দাশগুপ্তার সঙ্গে 'যুগান্তর' দলে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর উপর ছিল দলের বিশেষ দায়িত্ব। 'যুগান্তর' দলে যোগ দেওয়ার পর বীণা দাসের বিয়ে হয় বিপ্লবী সতীশচন্দ্র ভৌমিকের সঙ্গে। সতীশ ভৌমিক ছিলেন বীণার সহকর্মী। ১৯৩২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ডায়মেশন কলেজের ছাত্রী বীণাদাস বাংলার গভর্ণর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়েন। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়। বীণাদাস পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। বিচারে তাঁর নয় বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। যদিও তিনি মুক্তি পেয়েছিলেন ১৯৩৯ সালে। ভারত-ছাড়ো আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বীণা দাসকে তিনবছর রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে আটক থাকতে হয়েছিল। তিনি 'শৃঙ্খলের ঝংকার' নামে একটি আত্মজীবনী লেখেন।

টিটাগড় ষড়যন্ত্র মামলায় প্রধান অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন শ্রীমতী পারুল মুখার্জি। টিটাগড় বিপ্লবী ডেরার প্রকৃত দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল পারুল মুখার্জির ওপর। অস্ত্রশস্ত্র থাকত তাঁরই হেফাজতে। পারুল মুখার্জির বিরুদ্ধে বিস্ফোরক পদার্থ আইনেও চার্জ গঠন করা হয়েছিল। মামলার তদন্ত, সাক্ষীদের সাক্ষ্য ও নথিপত্র থেকে জানা গিয়েছিল টিটাগড় বিপ্লবীদের একটি আখড়া ছিল। এই আখড়াটিকে আগলে রাখতেন শ্রীমতী পারুল মুখার্জি। এই আখড়াটির সাথে সম্পর্কিত বিপ্লবীদের অনেকসময় তাঁকেই পরিচালনা করতে হতো। সশস্ত্র বিপ্লবী কাজকর্মের স্বার্থে পারুল মুখার্জি 'নীহার' 'শান্তি', 'আরতি', 'শোভারাণী', 'রাণী', 'খুকি' 'সুরমাদেবী' প্রভৃতি ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। পারুল মুখার্জিকে নানা ধরনের অস্ত্রবিদ্যায় তালিম দেওয়া হয়েছিল। তিনি আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে জানতেন। বিস্ফোরক পদার্থ দিয়ে বোমা বাঁধতে পারতেন। লাঠি ও নানা ধরনের মারণাস্ত্র ব্যবহার করতে পারতেন। নারী হয়েও পারুল দেবী ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী দলের সম্পদ।

শান্তি ও সুনীতি দুই বিস্ময় উদ্রেককারী কিশোরী। তিরিশের দশকে পরপর কতকগুলি ঘটনায় সারা বাংলাদেশ তোলপাড় হয়ে উঠেছিল। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখল, হিজলি বন্দী নিবাসে রাইটার্সের অলিন্দযুদ্ধে বিনয়, বাদল, দিনেশের শহীদ হওয়া, পুলিশের গুলি চালনা, বিচারপতি গার্লিক ও মেদনীপুরের কুখ্যাত ম্যাজিস্ট্রেট পেডী হত্যা, এই সমস্ত ঘটনার প্রেক্ষিতে বিপ্লবীদলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পনেরো ও চোদ্দ

বছরের দুই কিশোরী শান্তি ও সুনীতির দায়িত্ব বর্তায় কুমিল্লার জেলাশাসক ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে হত্যা করার। ১৯৩১ এর ১৪ ডিসেম্বর কুঠিতে গিয়ে শান্তি, সুনীতি গুলি করে হত্যা করে স্টিভেন্সকে।

'প্রকাশ, অদ্যপ্রাতে আন্দাজ ৯টার সময় দুইটি বাকিলা মি.স্টিভেন্সের বাংলোতে তাঁহার সহিত দেখা করিতে গিয়াছিল। তাহারাই রিভলবার দ্বারা গুলী করিয়া মি.স্টিভেন্সকে হত্যা করিয়াছে।'

(আনন্দবাজার, ১৫-১২-৩১)

— গ্রেপ্তার হলেন শান্তি ঘোষ ও সুনীতি চৌধুরী। সরকারী চণ্ডনীতি এবার ক্ষিপ্তভাবে নির্যাতনের মুষল চালালো। সুনীতির পরিবার, তার বৃদ্ধ পিতা-মাতা অকথ্য অত্যাচারের শিকার হল। বিস্ময় চরমে উঠল যখন শান্তি ও সুনীতিকে আদালতে আনা হল, বিশ্বাস করা শক্ত, ওরা মেরেছিল সাহেবটাকে। গানে-গল্পে-হাসিতে-উচ্ছাসে গোটা আদালতটাকেই বুঝি মাথায় করে তুলেছিল তারা। বসতে চেয়ার দেওয়া হয়নি বলে সেদিন কোর্ট শেষ না হওয়া পর্যন্ত সর্বক্ষণ ওরা হাকিমের দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইলেন, দেয়ালের দিকে মুখ করে। সবচেয়ে মজার বিষয় হয়েছিল যখন প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে এস.ডি.ও নেপাল সেন সাক্ষীর কাঠগড়ায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন। প্রশ্নের উত্তরে যতবার তিনি মুখ খুলতে চেয়েছেন, ততবার দু'জনে সমস্বরে কোরাস তুললেন—গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার! গ্রেট লায়ার! যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হলে সেকি দুঃখ, আর অভিমান! বড় সাধ ছিল হাসতে হাসতে ফাঁসির-দড়িটা নিজের হাতে গলায় তুলে নেওয়ার, সাহেবটা শত্রুতা করে মাঝ থেকে সব পণ্ড করে দিল।

বিপ্লবী দলের সদস্যের আশ্রয়দাত্রী হিসাবে মেটিয়াবুরুজ কলুটোলার রাজেন গুহর স্ত্রী সরযূ গুহর নাম উল্লেখযোগ্য। বেঙ্গল ভলন্টিয়ার দলের সদস্য বিনয় বসু ১৯৩০ সালের ২৯ আগস্ট ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালে বাংলার পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে গুলি করে হত্যা করে। পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়িয়ে বিনয় কলকাতায় এসে তিনমাস আশ্রয় গ্রহণ করে সরযূদেবীর কাছে। সেখান থেকেই বিনয় অলিন্দযুদ্ধে অংশ নিয়ে শহীদ হন।

কুমিল্লার মেয়ে প্রফুল্ল নলিনী ব্রহ্ম যুগান্তর দলের মহিলা সংগঠন গড়ে তোলেন। প্রথম দিকে বিপ্লবী নেতাদের প্রবল আপত্তি ছিল কোনো মেয়েকে সংগঠনে অন্তর্ভুক্ত করা। কিন্তু প্রফুল্ল নলিনীর ছাতার কাছে তাঁদের সমস্ত আপত্তি ও দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে মহিলা সংগঠন তৈরি করার দায়িত্ব দেওয়া হলো। শান্তি ও সুনীতিকে বিপ্লবী দলে নিয়ে এসেছিলেন তিনিই। স্টিভেন্সকে হত্যা করতে তাঁরই যাবার কথা ছিল কিন্তু কোনো কারণবশত তা হয়নি। শান্তি ও সুনীতিকে গ্রেফতারের পর পুলিশ প্রফুল্ল নলিনীকেও গ্রেফতার করে। প্রথমে কুমিল্লা ও পরে হিজলি জেলে তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। ১৯৩১-৩৬ গৃহে অন্তরীণ থাকেন; সেখানেই অ্যাপেণ্ডিকস রোগ হয়। পুলিশের বাধাদানে কলকাতায় নিয়ে আসা সম্ভব হয়নি। বিনাচিকিৎসায় ১৯৩৭ সালে

তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

বনলতা দাশগুপ্ত (নীনা) ছিলেন ডায়সেশন স্কুলের ছাত্রী, বিদ্যালয়ে পাঠরত অবস্থাতেই স্বদেশী আন্দোলনে আকৃষ্ট হন তিনি। কিশোরী বয়সে যোগ দেন বিপ্লবী যুগান্তর দলে, বীণা দাসের সহযোগী হিসাবে। কলেজে থাকাকালীন কয়েকটি রিভলবার রাখার অভিযোগে পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। তিনবছর প্রেসিডেন্সি এবং হিজলি জেলে ডেটিনিউ হিসাবে বন্দী ছিলেন। লালবাজার লকআপে থাকাকালীন তাঁর উপর অমানুষিক নির্যাতন চালায় পুলিশ। পরে প্রেসিডেন্সির একটি নির্জন সেলে তাঁকে একমাস বন্দী করে রাখা হয়। পরবর্তী সময়ে হিজলি জেলে পাঠানো হলে এক বৎসর কারাভোগের পর দুরারোগ্য টক্সিকগয়টার রোগে আক্রান্ত হন। কারা কতৃপক্ষ তা সত্ত্বেও তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে যেতে থাকেন, অগত্যা বনলতাকে কলকতা মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তরিত করা হলেও তখন চিকিৎসকদের কিছু করার ছিল না। মাত্র ২১ বছর বয়সে এই বিপ্লবী কন্যার জীবনাবসান হয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ পুষ্পময়ী বসু সংস্কৃত অনার্সে প্রথম স্থান পান কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রাজশাহীতে পি এন বালিকা বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষিকা হিসাবে যোগ দেন। স্বদেশী তরুণ তরুণীদের আশ্রয় দেবার কারণে সরকারের রোষানলে পড়ে একদিনের নোটিসে স্কুলের চাকরি ছাড়তে বাধ্য হন।

মীরা দত্তগুপ্তা, যিনি বিদ্যাসাগর কলেজের উপাধ্যক্ষা হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করার পরেও বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স দলের গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক সিদ্ধান্তে অংশগ্রহণ করতেন। উক্তদলের ভলান্টিয়ার্সরা ১৯৩১-৩৩ সালের মধ্যে মেদিনীপুরের তিনজন জেলাশাসককে হত্যা করলে পুলিশের নজর এসে পড়ে মীরা দত্তগুপ্তর উপর। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি করে এবং দপ্তরে এনে জেরা করেও কিছু বের করতে না পেরে দু'বছরের জন্য বাংলাদেশের বাইরে চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশ।

নেত্রী সুধা রায়। ছাত্রাবস্থাতে বিপ্লবী অনুশীলন দলে যোগদান করেন। বিপ্লবী দলের বহু গোপন কাজে তিনি প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

শহীদ অমিয়া দত্তের বাপের বাড়ি ব্রজযোগিনী গ্রাম ছিল সশস্ত্র বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা। যে সমস্ত যুবক সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত তাঁদের গ্রেফতার করে প্রকাশ্য রাস্তায় হাতে বেড়ি ও কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবার সময়ও যে অত্যাচার তা প্রত্যক্ষ করে অমিয়া নিজেও বিপ্লবী দলের কাজের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ওঠেন ও সক্রিয়ভাবে গোপন কাজে যুক্ত হয়ে পড়েন।

শহীদ প্রতিভা গাঙ্গুলি বিংশ শতাব্দীর এমন একটা সময় জন্মে ছিলেন যখন সারা বাংলাদেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের দোলায় উদ্বেলিত। প্রতিভার সম্পর্কিত দুই কাকা বিপ্লবী যুগান্তর দলের সক্রিয় কর্মী ছিলেন, তাদের অনুপ্রেরণায় তিনি বিপ্লবী কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র, প্রচারপত্র গোপনে রক্ষা করা এবং প্রয়োজনে সেগুলি বহন করা এবং বিপ্লবীদের আশ্রয় দান

প্রভৃতি কাজ তিনি নিষ্ঠাভরে করেছেন।

ভানুদেবী শুধুমাত্র আদর্শের তাগিদে সেই সময়কার দেশাচার, লোকাচার সামাজিক নিন্দা ও রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে রক্ষণশীল শ্বশুরবাড়ি ও স্বামী সংসার পরিত্যাগ করে অসীমসাহসে বিপ্লবী অনুশীলন দলে যোগ দিয়েছিলেন ২৬ বছর বয়সে। যশোহর জেলায় তিনিই প্রথম মহিলা কর্মী যিনি বিপ্লবী দলের কাজে তিনের দশকে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। গোপন কাজে সাহায্য করা, আগ্নেয়াস্ত্র বহন করা অথবা দলীয় কর্মীদের লুকিয়ে রাখার মতো বিপজ্জনক কাজ তিনি করতেন বলে রক্ষণশীল সমাজের কুৎসা, অবমাননা, ধিক্কার সবই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারি হলে তিনি আত্মগোপন করতে পুরীতে চলে যান। বিচিত্রাদেবী এই ছদ্ম নামে তিনি কাজ চালিয়ে গেছেন। পরে বিপ্লবী সংস্থার পরামর্শে ভবানীদেবী নামে জুনিয়র ট্রেনিং স্কুলে ভর্তি হন।

বাংলার নারী আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসর্গীকৃত একটি নাম লীলা নাগ (রায়)। প্রথমে দীপালি সঙ্ঘ ও পরে দীপালি ছাত্রী সঙ্ঘ গঠন করেন। ১৯২৫ সালে শ্রীসঙ্ঘ নামে একটি বিপ্লবী দলে লীলা নাগ যুক্ত হন। দীপালি সঙ্ঘ এবং দীপালি ছাত্রী সঙ্ঘে নানাবিধ কাজের মধ্যে মেয়েদের লাঠি-ছুরি খেলা, ব্যায়াম, বিভিন্ন শারীরিক কসরৎ ইত্যাদি শেখানো হতো। এই দলের বহু ছাত্রী সশস্ত্র বিপ্লবী দলগুলির কাজের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩০ সালের ২০ ডিসেম্বর তাঁকে বন্দী করা হয় বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্ট অনুসারে। লীলা নাগ ও রেণু সেন এঁরা দুজনেই ডিটেনশন প্রাপ্ত প্রথম ভারতীয় নারী। প্রথমে সিউড়ি ও পরে হিজলী জেলে তিনি সাত বছর কাটান।

হেলেনা দত্ত ছিলেন দীপালি সঙ্ঘের সদস্য। হেলেনার উদ্যোগে নানা দেশের বিপ্লবী কার্যকলাপের বই ইডেন হাইস্কুলের ছাত্রীদের পড়ানো হতো। সশস্ত্র বিপ্লবীরা রিভলভার, পিস্তল, গুলি প্রকৃতি হেলেনার কাছে রাখতে দিলে তিনি সেগুলি বোর্ডিং এর গুপ্ত জায়গায় রেখে দিতেন। হেলেনার বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের আশ্রয়স্থল।১৯৩৩ সালে তাই ঢাকা থেকে হেলেনা পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি এড়াতে চলে আসেন বরাহনগরে মামার বাড়ি। সেখান থেকে পুলিশ হেলেনাসহ মামাবাড়ির সবাইকে গ্রেপ্তার করে এবং বাড়িটিও বাজেয়াপ্ত করে। লালবাজারে ২৮ দিন থাকার পর হিজলী ও অন্যান্য জেলে চার বছর কাটানোর পর ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান।

১৯৩০, ১লা ডিসেম্বর চাঁদপুর স্টেশনে ইন্সপেক্টর তারিনীনাথ মুখার্জীকে হত্যার অপরাধে গ্রেপ্তার হলেন দু'জন বাঙালি যুবক রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, কালীপদ চক্রবর্তী। তাদের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছে তিনটি গুলি ভরা রিভলবার, একটি আস্ত বোমা, কতকগুলি কার্তুজ এবং কয়েকটি বৈদ্যুতিক মশাল। বিচারে রামকৃষ্ণের হল প্রাণদণ্ড, বয়স কম হওয়ায় কালীপদ চক্রবর্তীকে দেওয়া হল যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। যথাসময়ে রামকৃষ্ণ একদিন জীবন উৎসর্গ করলেন ফাঁসির মঞ্চে, কিন্তু যাবার আগে তাঁর অপূর্ব সংগঠন শক্তির এমন একটি উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেলেন, যা অগ্নিযুগের ইতিহাসে

আজও আপন দীপ্তিতে দীপ্যমান হয়ে আছে। সেই উজ্জ্বল রত্নটি হলেন—প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার। এই প্রীতিলতাই সেদিন ছোটোবোন অমিতা পরিচয়ে রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতেন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে দিনের পর দিন। রামকৃষ্ণের ফাঁসির পরেই প্রীতিলতা কলকাতার জীবন শেষ করে চট্টগ্রাম ফিরে গেলেন দুর্জয় সংকল্প বুকে নিয়ে, যে করে হোক, মাস্টারদার সঙ্গে একবার পরিচিত হতে হবে, তাঁকে যে বড্ড প্রয়োজন। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হয়নি, যথাসময়ে একদিন তিনি মাস্টারদার পদপ্রান্তে হাজির হয়েছিলেন ছোট্ট একটা দাবী নিয়ে। 'একটা সুযোগ দিন মাস্টারদা! শুধু একটা সুযোগ!' সূর্যসেন প্রীতিকে দায়িত্ব দিয়ে বলেছিলেন "বাংলার ঘরে ঘরে বীর যুবকদের অভাব নেই,...কিন্তু ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক যে, এই দেশের মেয়েরাও আজ পিছিয়ে নেই।" স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম মহিলা শহীদ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমাণ করেছিলেন ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত সশস্ত্র সংগ্রামে পুরুষদের মতো মহিলারাও সমভাবে জীবন বলিদানে প্রস্তুত। একুশ বছরের এই যুবতী মাস্টারদার নির্দেশে অন্যান্য পুরুষ সহকর্মীদের নিয়ে পাহাড়তলি রেলওয়ে ইন্সটিটিউশন যেখানে ইংরেজ শাসকেরা সান্ধ্য প্রমোদে মিলিত হতো সেটি আক্রমণের নেতৃত্ব দেন। ১৯৩২-এর ২৪ সেপ্টেম্বর পাহাড়তলির ক্লাবে সফল আক্রমণের পর প্রীতিলতা তাঁর সাতজন সঙ্গীকে পালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন। পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার এড়াতে তিনি পটাসিয়াম সায়নাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর আগেরদিন অজ্ঞাতবাস থেকে মাকে লক্ষ করে প্রীতিলতার চিঠি বড়ই মর্মস্পর্শী —"মাগো, তুমি অমন করে কেঁদোনা! আমি যে সত্যের জন্য স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিতে এসেছি, তুমি কি তাতে আনন্দ পাওনা?....দেশমাতৃকা যে শৃঙ্খলভারে অবনতা, লাঞ্ছিতা, অবমানিতা! তুমি কি সবই নীরবে সহ্য করবে মা? একটি সন্তানকেও কি তুমি মুক্তির জন্য উৎসর্গ করতে পারবেনা?" দেশের মা বোনেদের কাছে আহ্বান জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন, যা তাঁর সেনাপোশাকের মধ্যে রক্ষিত ছিল —

"আমি ঐকান্তিকভাবে আশা করি যে আমার দেশের ভগিনীরা আর নিজেকে দুর্বল মনে করিবেন না, সশস্ত্র ভারতীয় নারী সহস্র বিপদ ও বাধাকে চূর্ণ করিয়া এই বিদ্রোহ ও সশস্ত্র মুক্তি আন্দোলনে যোগদান করিবেন এবং তাহার জন্য নিজেকে তৈয়ার করিবেন,— এই আশা লইয়াই আমি আজ আত্মদানে অগ্রসর হইলাম।"

প্রীতীলতা ওয়াদ্দেদার ২৪/০৯/১৯৩২

চট্টোগ্রাম বিদ্রোহের অগ্নিকন্যা কল্পনা দত্ত অসীমসাহস ও বীরত্ব নিয়ে সূর্যসেনের ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি দলে যোগদান করেছিলেন। বারো বছর বয়স থেকেই কল্পনার হাতে ক্ষুদিরাম, কানাইলালের জীবনী, 'পথের দাবী' প্রভৃতির মতো বই এসে পড়ে। বেথুন কলেজে পড়ার সময়ে কল্যাণীদাস প্রতিষ্ঠিত 'ছাত্রী সংঘ' এ যোগদানের মাধ্যমে তার রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশ। ১৯৩১ এ মাস্টারদা তাঁকে দায়িত্ব দেন ডিনামাইট ফাটিয়ে জেল থেকে অনন্তসিংহ, গণেশ ঘোষ প্রমুখকে মুক্ত করার। তিনি কলকাতা থেকে ৮০ পাউণ্ড অ্যাসিড সংগ্রহ করে, বাড়িতেই কটনগান তৈরি করতে শুরু করেন।

পুলিশের কাছে খবর পৌছে গেলে তাঁকে নজরবন্দী অবস্থায় গৃহে আটক করে রাখা হয়। ধলঘাটে ক্যামেরুন হত্যা ও অন্যান্য কয়েকটি ফৌজদারি মামলায় মাস্টারদা, তারকেশ্বর ঘোষ দস্তিদার এবং কল্পনা দত্তকে মূল আসামী করা হয়। বাকি দু'জনকে ফাঁসির আদেশ দেওয়া হয়। কল্পনা মেয়ে বলে যাবজ্জীবন তাঁকে কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়, প্রথমে দ্বীপান্তরের হুকুম হলেও পরে তা পরিবর্তন করে কারাদণ্ডই দেওয়া হয়। সারাদেশের আন্দোলনের চাপে অন্যান্য রাজবন্দী মহিলারা মুক্তি পেলেও কল্পনা পাননি। ১৯৩৮ সালে মহাত্মাগান্ধীর মধ্যস্থতায় তিনি মুক্তি পান।

ইন্দুমতী সিংহ ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের অন্যতম নেতা অনন্ত সিংহের বড় দিদি। তিনি বিপ্লবীদলের সদস্য ছিলেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে ধৃতদের মামলা পরিচালনায় অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব ছিল তাঁর উপর। তিনি যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে এই কাজ করেছেন। তিনি বাংলাদেশ ছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে গিয়ে টাকা জোগাড় করতেন। এমনকি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর কাছ থেকেও ৫০০ টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। লালবাজারের পুলিশের ঘাঁটিতে গিয়ে টাকা আদায় করেছেন। তিনি অর্থ সংগ্রহ করতে যেদিন কুমিল্লা পৌছান তার আগের দিনই সুনীতি ও শান্তি ম্যাজিস্ট্রেট স্টিভেন্সকে গুলি করে হত্যা করে, এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র ও জেল থেকে বন্দীমুক্তির পরিকল্পনার অভিযোগও ছিল। ১৯৩১ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন ও একাদিক্রমে পাঁচ বছর কারাবাস করেন।

বিপ্লবী রতন সেনের মা বিনোদিনী সেন বিভিন্নভাবে চট্টল বিপ্লবীদের সাহায্য দান করেছেন। ওনার বাড়িটা একসময় বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয় ছিল চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পরে যখন বিপ্লবীদের ধরার জন্য পুলিশ প্রশাসন হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, তখন একদিন মাঝরাতে গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, লোকনাথ বল, রতন সেন নিজে ঐ বাড়িতে আশ্রয় নেন, পরের দিন সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী বাড়িটি ঘিরে ফেলে, বিনোদিনী দেবীর উপস্থিত বুদ্ধিতে দলটি পালাতে সক্ষম হয়।

ইতিহাস বলে—'ইংরেজ বীরের জাত'—তদুপরি নারীর সম্মান রাখতে তাদের জুড়ি নেই। বুড়িবালামের তীরে নিহত বিপ্লবী বীর বাঘাযতীনকে টুপি খুলে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিল স্বয়ং পুলিশ কমিশনার চার্লস টেগার্ট।—স্রেফ ভণ্ডামি। ইংরেজ আর কিছু না জানলেও পাবলিসিটির ভড়ংটুকু বেশ ভালো করেই জানে, তাই ক্ষুব্ধ দেশবাসীর কাছ থেকে বাহবা নেবার জন্য সেদিন এই শো টুকু দেখানো তার প্রয়োজন ছিল। এই চার্লস টেগার্টই, চট্টগ্রামের বীর বিপ্লবীদের আশ্রয় দেবার অপরাধে শ্রদ্ধেয়া সুহাসিনী গাঙ্গুলীকে ক্রমাগত চড় মেরে মেরে জখম করেছিল। যুগান্তর দলের নেতা ভূপেন্দ্র দত্তর সহায়তায় চন্দনগরে বিপ্লবীদলের জন্য একটি আশ্রয়স্থল তৈরি করা হয়। এই গুপ্ত ডেরাটিতে সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শশধর আচার্য স্বামী-স্ত্রী সেজে ওদের আশ্রয় দেন। ১৯৩০ এর ১ সেপ্টেম্বর আচমকা হানা দিয়ে ডেরাটি ঘিরে ফেলে পুলিশ। অন্যবিপ্লবীদের সঙ্গে সুহাসিনীও গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২-৩৮ ছয় বছর তাঁকে হিজলী

জেলে কাটাতে হয়েছে। ইলেকট্রিকশকসহ বহু অত্যাচারেও সুহাসিনীর কাছ থেকে পুলিশ কোন কথা বার করতে পারেনি।

ধলঘাটের যে বাড়িতে মাস্টারদা তাঁর সাথীদের নিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, যেখানে পুলিশ ও বিপ্লবীদের সংঘর্ষে পুলিশ অফিসার ক্যামারুন মারা যায়, সে বাড়িটি ছিল অত্যন্ত দরিদ্র এক বিধবা, সাবিত্রীদেবীর। সূর্যসেন, নির্মলসেন, অপূর্ব সেন ও প্রীতিলতা তাদের সাথে যথেষ্ট পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আত্মগোপন করেছিলেন ওই বাড়িতে। সাবিত্রী দেবী এই কাজের ঝুঁকির কথা জেনেও কোন দ্বিধা করেননি বাড়িতে স্থান দিতে। ১৯৩২ সালের ১২ জুন ক্যাপ্টেন ক্যামারুনের নেতৃত্বে গভীর রাতে পুলিশ বাড়িটি ঘিরে ফেলে। তুমুল সংগ্রামে একদিকে নিহত হন বিপ্লবী অপূর্ব সেন ও নির্মল সেন অপরদিকে ক্যাপ্টেন ক্যামারুন। সাবিত্রীদেবীর মেয়ে রাজসাক্ষী হয়ে যায়। শত অত্যাচারেও একটি কথাও সাবিত্রীদেবী বা তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণর কাছ থেকে পুলিশ আদায় করতে পারেনি। মা ও ছেলে দু'জনেই সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সাবিত্রীদেবীর মাটির বাড়িটি ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হয়। পুত্র রামকৃষ্ণ যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে পাশের জেলে থাকলেও মৃত্যুর আগে তাঁর সাথে দেখা করার অনুমতি পর্যন্ত সাবিত্রীদেবীকে অমানবিক পুলিশ ও কারা কর্তৃপক্ষ দেয়নি।

১৯৩৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, মাস্টারদা তখন গৈরালাগ্রামে। ইংরেজ সরকার তাঁর মাথার দাম ধার্য করেছেন দশহাজার টাকা। গত তিন বছরের মধ্যে একটি লোকও পুলিশের সঙ্গে কোনোরকম সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসেনি। দলের বিশ্বস্ত কর্মী ব্রজেন সেন এ গাঁয়েরই লোক, তিনিই নিয়ে এসেছেন তাঁকে নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে, সঙ্গে রয়েছেন অনুগত সহকর্মীর দল— শান্তি চক্রবর্তী, কল্পনা দত্ত, সুশীল দাশগুপ্ত, মনিদত্ত প্রমুখ। আশ্রয় দিয়েছেন বিশ্বাসবাড়ির গৃহবধূ ক্ষিরোদপ্রভা বিশ্বাস। মাস্টারদাকে আশ্রয় দেওয়া মানেই অনিবার্য বিপদকে ডেকে আনা। তবু তিনি নিজের সিদ্ধান্তে স্থির, অবিচল। জেনেশুনে সর্বত্যাগী মানুষটিকে হিংস্র হায়েনার মুখে ঠেলে দিতে রাজী নন তিনি। বিপদ এল ব্রজেন সেনের দাদা প্রতিবেশী নেত্র সেনের দিক থেকে। কড়কড়ে দশহাজার টাকার লোভে ঋণগ্রস্ত, মাতাল, জুয়াড়ী নেত্রসেনের দেখানো আলোর সিগন্যালে ক্যাপ্টেন ওয়ামস্লীর নেতৃত্বে বিরাট এক গুর্খা বাহিনী ঘিরে ফেলে গোটা বাড়ি। দীর্ঘদিন বাদে ধরা পড়ে চট্টলসূর্য। পুরস্কার অবশ্য নেত্র সেন ঠিকই পেয়েছিলেন, কিন্তু অন্যভাবে। একদিন রাতে বেশ আয়েস করে খেতে বসেছিলেন, সারা মুখে খুশির ছটা, টাকাটা শীগগিরই পাওয়া যাবে বলে জানা গেছে — দেরি নেই। কিন্তু মুহূর্তবাদেই...ভোজালীর এক কোপে তাঁর মুণ্ডটা ধড় থেকে আলাদা হয়ে ভাতের থালার ওপর গড়াগড়ি খেয়েছিল। ঘৃণ্য বিশ্বাসঘাতককে চরমশাস্তি পেতে হয়েছিল।

নির্মলা চক্রবর্তী ছিলেন চট্টগ্রামের অজপাড়াগাঁয়ের এক পুরোহিত বাড়ির মেয়ে। মাস্টারদা ও তাঁর সহকর্মীরা একসময় ওদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পরে তা

প্রকাশ হয়ে পড়লে পুরো পরিবারই গ্রেপ্তার হয়ে যায়। নির্মলাকে হিজলি জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই সমস্ত রাজবন্দীনীদের মধ্যে সব থেকে ছোট ছিলেন নির্মলা।

চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলের নানাবিধ কাজে যুক্ত ছিলেন অসংখ্যনারী। অনিমা বিশ্বাস, প্রমীলা দাস, পরিমলবালা সেন, কুন্দাপ্রভা সেনগুপ্ত, জ্যোতিপ্রভা দাস, চন্দ্রবাণীদেবী, মৃণালিনী সেন, রাজলক্ষ্মী দেবী, রেণু রায়, নন্দিনীপাল, সরোজিনী পাল —এঁরা প্রত্যেকেই চট্টল বিদ্রোহে কোন না কোন সময়ে অংশগ্রহণ করেছেন সামাজিক-পারিবারিক সব বাধা অতিক্রম করে।

প্রতিমা পাল ছিলেন দেশপ্রেমিক অটলবিহারী পালের কন্যা। মাত্র ১৫ বছর বয়সে নেতাজীর আহ্বানে 'ঝাঁসি রাণী' বাহিনীতে যোগদান করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে লেফটেন্যান্ট পদে উন্নীত হন।

বেলামিত্র মাত্র ২৪ বছর বয়সে মহিলাবাহিনীর কমাণ্ডার নির্বাচিত হন।

শচীসেন আদতে চট্টগ্রামের মেয়ে হলেও পড়াশুনা করতেন রেঙ্গুনে। নবম শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালীন ঝাঁসিবাহিনীর ডাকে সাড়া দিযে নার্সিং স্কোয়াডে ভর্তি হয়েছিলেন। হাসপাতালে আহত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের সেবা করা ছিল তার মূল কাজ। সেই কাজ করতে করতেই হাসপাতালে মারা যান শচীদেবী।

বরিশালের মেয়ে সরোজআভাদেবী ১৯২৯ সালে 'অনুশীলনসমিতি'র নীতিতে বিশ্বাসী হয়ে স্থানীয় 'অনুশীলন' দলের মহিলা সংগঠনের প্রতিষ্ঠাত্রী ছিলেন। তাঁর প্রভাবে তাঁর মা ভাইরাও প্রভাবিত হন এবং সমস্ত পরিবারই বিপ্লবীদের একটি প্রধান অবলম্বনস্বরূপ হয়। তাঁদের বাড়িতে নিষিদ্ধ পুস্তকাদি ও অন্যান্য দ্রব্য লুকিয়ে রাখা হতো। টিটাগড় যড়যন্ত্র মামলার পূর্বে সংশ্লিষ্ট আত্মগোপনকারী বিপ্লবীরা দুর্যোগের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিলেন—এই সময় সরোজআভাদেবী ও তাঁর সহকর্মিনী মেয়েরা অর্থ দিয়ে এবং অলঙ্কার বিক্রি করে বিপ্লবীদের জীবন যাপনের ও বিপ্লবের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতেন। বিপ্লবীদের আশ্রয়ের একটা গোপন কেন্দ্র ছিল সরোজ আভার বাড়ি। বাড়ি তল্লাশী করা, তাঁকে বারে বারে থানায় নিয়ে গিয়ে জেরা করা হতে থাকে। কিন্তু তিনি তাঁর বুদ্ধিমত্তা সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দ্বারা সবসময় পুলিশের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করে দিয়েছেন। অবশেষে ১৯৩৫ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করে রাজবন্দীরূপে দিনাজপুর, দার্জিলিং, মেদিনীপুর প্রভৃতি নানা জেলে বন্দী রাখে প্রায় দু'বছর। ১৯৩৭ সালে তিনি মুক্তি পান। ১৯৩৮ সালের বিপ্লবী ধীরেন্দ্রনাথ নাগের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময়ও তিনি নিজের বাড়িকে কর্মীদের আশ্রয়স্থল করে তোলেন এবং তাঁর আশ্রয়ে থেকে বিপ্লবীরা আন্দোলন পরিচালনা করেন।

ইলা সেন কলেজে পড়াকালীন জাতীয়-আন্দোলনের স্রোতে গা ভাসিয়ে দেন। ১৯২৯ সালে কল্যাণী দাসের ছাত্রী সংঘের সদস্যাপদ গ্রহণের মধ্য দিয়েই তাঁর স্বাধীনতা-আন্দোলনে হাতে খড়ি ঘটে। সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় সভা-ও শোভাযাত্রা বে-আইনী ঘোষণা করা হয়েছিল। ইলা সেন অশ্বারোহী পুলিশের সামনে দাঁড়িয়ে

সত্যাগ্রহীদের উপর পুলিশের আক্রমণ যথাসাধ্য প্রতিরোধ করার ইচ্ছা নিয়ে অতি সন্তর্পণে চলতে থাকেন। পুলিশ অফিসারের কথায় পাঠান অশ্বারোহী পুলিশ পুরুষ সত্যাগ্রহীদের উপর লাঠিচার্জ করতে অগ্রসর হয় নারীদের পাশ কাটিয়ে; কিন্তু অসম-সাহসিকতায় ইলা সেন পুলিশ অফিসারের ঘোড়ার লাগাম দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে ফেলেন। ফলে ঘোড়াটি লাফাতে থাকে এবং তিনিও সমানে যুঝে যান। এই দুঃসাহসিক কাণ্ডে সেদিন সবাই বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে পড়েন। এক সামান্যা নারীর অসামান্য দৃঢ়তা ও দুঃসাহস সেদিন বহু সত্যাগ্রহীর মাথা বাঁচিয়েছিল। ১৯৩০ সালে জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের উপর পুলিশ কমিশনার টেগার্টের অত্যাচারের প্রতিবাদে তিনি জেলে অনশন শুরু করেন।

মেধা ঘোষ বি.এসসি.পড়াকালীন১৯৪২ সালে ভারত ছাড়ো আন্দোলন শুরু হয়—তিনি উজ্জ্বলা মজুমদার প্রমুখদের সংস্পর্শে এসে আন্দোলনে নেমে পড়েন। অর্থ সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে গোপন ইস্তাহার রচনা ও বিলি করা তাঁর প্রধান কাজ ছিল। 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সে'র কর্মী রাতুল রায়চৌধুরীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তিনি প্রায় আড়াই বছর আত্মগোপন করে কাজ করে যান। ১৯৪৫ সালের মার্চ মাসের এক গভীর রাতে তাঁদের বাড়ি তল্লাশী করা হয় এবং তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কিন্তু পুলিশ মেধাকে কোনো যড়যন্ত্রে জড়াতে পারেনি। যদিও নিরাপত্তা বন্দীরূপে তাঁকে প্রেসিডেন্সী জেলে কাটাতে হয়। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১৯০০ সালে বরিশালের পটুয়াখালিতে জন্মগ্রহণ করেন লাবণ্যপ্রভা দাশগুপ্ত। পিতার মৃত্যুর পর ঢাকায মাতুলালয়ে থাকার সময়ে বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও লীলানাগের সংস্পর্শে এসে তাঁর রাজনৈতিক জীবনের আরম্ভ। দশম শ্রেণির ছাত্রী থাকাকালীনই ১৯৩৪ সাল থেকে তিনি চারবছর রাজবন্দী ছিলেন। লীলানাগ প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীসংঘ'-এর মতো বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গেও তিনি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে তিনি সবার কাছে 'বড়দি' নামে পরিচিত ছিলেন। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনে'র সময় তিনি গ্রেপ্তার হন এবং নিরাপত্তা বন্দীরূপে ঢাকা, দিনাজপুর ও প্রেসিডেন্সী জেলে অন্তরীন থাকার পর ১৯৪৫ সালে মুক্তিলাভ করেন।

স্বদেশীভাবাপন্ন পিতামাতার সন্তান মীরা দত্তগুপ্তর বাড়িতে বিদেশী দ্রব্যের স্থান ছিল না। পারিপার্শ্বিক পরিবেশ তাকে সহজেই স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ১৯৩০ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অঙ্কশাস্ত্রে এম.এস.সি পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন তিনি। পাঠ্যাবস্থায় 'বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স' এ যোগদান করেন। বিদ্যাসাগর কলেজের মহিলা বিভাগের ভাইস প্রিন্সিপাল থাকাকালীন ১৯৩১ সালে তার সমূহ বেতনই তিনি দলের ব্যয়নির্বাহের জন্য দিয়ে দিতেন। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত দলের পলাতক বিপ্লবীদের গতিবিধির যোগসূত্র যাঁদের মাধ্যমে পরিচালিত হতো, তাঁদের মধ্যে মীরাদত্তগুপ্ত ছিলেন অন্যতমা।

শান্তশ্রী মজুমদারের পিতা ছিলেন 'অনুশীলন সমিতি'র সক্রিয় কর্মী। ১৯৪৩ সালে

নেতাজী মৃত্যুভয়হীন নারী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে চাইলে তিনি সাড়া দেন। তাঁর মা তাঁকে 'রাণী ঝাঁসি বাহিনীর সদর দপ্তরে অধ্যক্ষক্যাপ্টেন স্বামীনাথনের কাছে রেখে আসেন। মাত্র তেরো বছর বয়সে তিনি ঝাঁসি বাহিনীতে যোগদান করেন। অল্প কিছুদিন পরেই তিনি রেঙ্গুনে যান। প্রশিক্ষণের শেষে তিনি অফিসার সিক্রেট সার্ভিসের জন্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হওয়ার পরই একটি সভা হয়— সেখানে তিনি নিজের আঙুল কেটে নেতাজীর কপালে রক্ততিলক এঁকে দেন। ১৯৪৫ সালে নেতাজীর নির্দেশে ক্যাম্প ছেড়ে বাড়ি চলে যান এবং কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকেন। নেতাজীর নির্দেশে তাঁর কাছে থাকা তথ্যপ্রমাণাদি পুড়িয়ে ফেলেন। ফলে ব্রিটিশ সরকার অনেক চেষ্টা করেও উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি।

১৯৩২ সালে ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন অনিতা বসু। ১৯৪৬ সালে ম্যাট্রিক পাশ করার পর থেকেই তিনি চতুর্দিকে রাজনৈতিক উত্তাপের স্পর্শ অনুভব করেন। তিনি পাড়ার মেয়েদের নিয়ে 'স্বাতী স্বেচ্ছাসেবিকা বাহিনী' গঠন করেন। বিপ্লবী জ্যোতি জোয়ারদার যখন ময়মনসিংহ শহরে 'আজাদ হিন্দ ভলান্টিয়ার্স কোর' প্রতিষ্ঠা করেন, অনিতা বসু তার 'ঝাঁসী-বাহিনী'র শাখার ভারপ্রাপ্ত হন। পরে তিনি 'ফরওয়ার্ড ব্লকে' যোগদান করেন।

প্রফুল্ল দত্তর স্ত্রী মুকুলদেবী ছিলেন বিপ্লবীদলের সদস্যদের কছে মুকুল বৌদি। জজ সাহেবের কন্যা হয়েও, স্বামী বিপ্লবী হওয়ায় মুকুলদেবী হয়ে উঠেছিলেন বিপ্লবী পথের সমর্থক। ১৯৩৩ সালে ফুলুদার গ্রেপ্তারের খবর পৌছেছিল ঢাকায়। তখনও মুকুল বৌদির কাছে ছিল একটি রিভলভার। যে কোন সময় গুপ্ত খবরের ভিত্তিতে বাসা তল্লাসী হতে পারে। রিভলভারটি সাবধানে রাখার প্রয়োজন ছিল। ভাসুর সত্যেন দত্ত ছিলেন রাশভারী লোক। তাঁর কাঁচের আলমারী খোলা দেখে তারই একটি তাকের বইয়ের পিছনে রিভলভারটি লুকিয়ে রেখেছিলেন মুকুল বৌদি। দলের লোকরা যখন এসে রিভলভারটি চেয়েছিলেন তখন আলমারীটিতে তালা দেওয়া ছিল। চাবি ছিল ভাসুরের কাছে। মহাবিপদ। তালা না খুলতে পারলে রিভলভারটি দেওয়া যাচ্ছিল না। অথচ এক মুহূর্ত দেরি করা যাচ্ছিল না। অগত্যা অন্যকোনো উপায় না পেয়ে মুকুল বৌদি ঘুসি মেরে কাঁচ ভেঙে হাত রক্তারক্তি করে রিভলভার উদ্ধার করে তখনই তিনি রিভলভারটি আলমারি থেকে বার করে দিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে পরিবারের কাছ থেকে অনেক কথা শুনতে হলেও, স্বামী ও দেশের জন্য তিনি সবই নিঃশব্দে সয়ে গিয়েছিলেন।

শৈলবাল দেবী বসবাস করতেন কলকাতার ভবানীপুরের ৫নং বিজয় মুখার্জী লেনে। তাঁর বাড়িটি ছিল একতলা। অতি সাধারণ চেহারার বাড়ী কিন্তু বেঙ্গলভলেন্টিয়ার্স পার্টির ইতিহাসে এই বাড়ীটির একটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস আছে। বিপ্লবী পার্টির ছেলেরা শৈলবালা দেবীকে ডাকতেন 'মাসিমা' বলে। শৈলবালাদেবীর বাড়ীটি হয়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের নিজস্ব আবাস, ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত। শৈলবালার বড় ছেলে

নীরদ দত্তগুপ্ত ছিলেন 'বেঙ্গল ভলানটিয়ার্সে'র প্রথম সারির সদস্য। এই বাড়ীটিতে পার্টির অ্যাকসন স্কোয়াডের মিটিং হয়েছে একাধিকবার। শৈলবালাদেবী সব সময় আগলে রাখতেন বাড়ীটি পুলিশের নজর এড়িয়ে। শৈলবালাদেবী রক্ষা করেছেন বহু পলাতক বিপ্লবীকে নিজের জীবনের ভয় না করে।

কুসুমকুমারী নাগ ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের মুক্তিমন্ত্রের বিপ্লবীদের মাতৃসমা একজন বয়স্কা মহিলা। বিপ্লবীদের নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতে গিয়ে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করেছেন কুসুম কুমারী দেবী। লোম্যান মার্ডারের পর ঢাকা থেকে পালিয়ে আসবার পথে বিনয় বসু যখন গেণ্ডারিয়াতে আশ্রয় নিয়েছিলেন তখন কুসুম কুমারী দেবী নিজে রান্না করে তাঁর খাবার পাঠিয়েছিলেন গুপ্তভাবে। নেপাল নাগের কলকাতার ১৩ নং কানাই ধর লেনের গোপন আস্তানারও তিনি ছিলেন রক্ষক। পলাতক বিপ্লবীরা এই আস্তানায় সবসময় আনাগোনা করে গোপন খবর আনা নেওয়া করতেন। এই বাড়ী থেকেই পুলিশ গ্রেপ্তার করেছিল বিপ্লবী মনোরঞ্জন সেন ও শশাঙ্ক দাশগুপ্তকে। এঁদের সঙ্গে কুসুমকুমারী দেবীকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। এক কাপড়ে তিনিও ১৮ দিন হাজতবাস করেছিলেন।

নগেন্দ্রবালা শুধু বিপ্লবী যতীশ গুহর মা-ই ছিলেন না। তিনি ছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবীদের মা। মায়ের মতোই শ্রদ্ধা করতেন অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা। লেবং রেস কোর্সে অ্যাণ্ডারসন হত্যা প্রচেষ্টার ফৌজদারী মামলার অভিযুক্ত আসামী ছিলেন মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও সুকুমার ঘোষও। এই দুই পলাতক আসামীকে আশ্রয় দিয়েছিলেন নগেন্দ্র বালাদেবী। ট্রাইবুনালের রায়ে মনোরঞ্জনের প্রাণদণ্ড হলে তার বিরুদ্ধে আপীল করার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। এই সময় নগেন্দ্রবালাদেবী তাঁর গহনা বিক্রি করে ২০০ টাকা সংগ্রহ করে তা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সংশ্লিষ্ট আইনজীবীর কাছে। আপীলে মনোরঞ্জনের মৃত্যুদণ্ড রদ হয়ে যাবজ্জীবন দণ্ডাদেশ হয়েছিল। দ্বীপান্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল মনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

যে বন্ধুর পথ ধরে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন বাংলার অসংখ্য নারী, সেই সংগ্রামী ইতিহাস নতুন ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে প্রেরণাস্বরূপ। স্বাধীনতার জন্য জীবনপণ করে ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সশস্ত্র বিপ্লবী কার্যকলাপে অকুতোভয়ে এগিয়ে এসেছিলেন হাজার হাজার বীরাঙ্গনা, এঁদের সবার নাম ইতিহাসের পাতায় নেই। স্বাধীনতার বেদীমূলে আত্মবলিদানের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের জয়যাত্রা শুরু করেছিলেন এই বঙ্গললনারা।

'পৃথিবী ও ইতিহাস কাঁপে
আজ অসহ্য আবেগে
ওদের পায়ের স্পর্শে মাটিতে সোনার ধান
রঙ লাগে মেঘে
এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ
ওদের' পতাকা।

মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী
আজ ঢাকা'

আশা করা যায় আগামীদিনে এই অবহেলিত ইতিহাস আরও বেশি করে উন্মোচিত হবে। জাতীয় জাগরণের মুক্তিযজ্ঞ সম্পূর্ণতা লাভ করবে। নারী হয়ে উঠবে অর্ধেক আকাশ। বিশ্বে স্বীকৃত হবে —

'এ পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি যা কিছু বিস্ময়কর
অর্ধেক তার রচিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। স্বদেশ সভ্যতা ও বিশ্ব — জীবন মুখোপাধ্যায়, শ্রীধর পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০১২, পুনর্মুদ্রণ— জানুয়ারি, ২০১৪

২। আধুনিক ভারত — সুমিত সরকার, কে.পি.বাগচী এণ্ড কোম্পানী, ২য় সংস্করণ ১৯৯৫।

৩। আমি সুভাষ বলছি (প্রথম খণ্ড)- শৈলেশ দে, বিশ্ববাণী প্রকাশনী, অষ্টম সংস্করণ, ১৪০২

৪। বঙ্গনারীর প্রগতি প্রবাহ — শ্যামলী গুপ্ত, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, প্রথম প্রকাশ, অক্টোবর ২০১২

৫। স্বাধীনতা আন্দোলনে সহিংস নারী — চিন্ময় চৌধুরী, দে'জ পাবলিশিং দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই ২০০৮

৬। স্বাধীনতা আন্দোলনে সশস্ত্র বিপ্লবী নারী — চিন্ময় চৌধুরী, তৃতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ২০১৩।

৭। প্রীতিলতা — সম্পাদনা শংকর ঘোষ, প্রমিথিউসের পথে, প্রথম প্রকাশ : ২৪ শে সেপ্টেম্বর, ২০০৭

'নারী তুমি মহীয়সী' : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

'নারী তুমি মহীয়সী'- একথা কে কবে আর স্বতঃস্ফূর্তভাবে নারীকে বলেছে? বিশেষত, যেখানে পুরুষ-প্রধান সমাজব্যবস্থা ও পিতৃতন্ত্রের নিয়ম-নির্দেশে নারীর জীবন আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা? নারীকে 'মহীয়সী' বলার অর্থ তার বিশেষ কোনো মহিমময় গুণকে স্বীকার করে নেওয়া। এই স্বীকৃতি ব্যক্তিগতভাবে কোনো নারী পুরুষের কাছ থেকে পেতেই পারে! কিন্তু সেখানে সমষ্টির প্রশ্নটাও এড়ানো যায় না। কারণ মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই, আত্মপরিচিতির অণ্বেষণ বিচ্ছিন্ন কোনো বিষয় নয়। পুরুষের তৈরি শৃঙ্খল ভাঙতে নারীকে শুধু পুরুষ নয়, পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধেই লড়াই করতে হয়। কিন্তু মধ্যযুগের সমাজে নারী যেখানে স্বামীকে 'দেবতা' বলে 'প্রভু' বলে মেনেছে, সেখানে তাদের পারস্পরিক সম্পর্কে বিশ্বাস ভালোবাসার অনুভূতিগুলিও অর্থহীন। মধ্যযুগের সমাজ-ব্যবস্থা ছিল এমনই। সামন্ততান্ত্রিক পুরুষ-শাসিত সমাজে প্রশ্নহীন সেবা ও আনুগত্যে নারী যেন শুধু ক্রীতদাসীর ভূমিকাই পালন করতো! তাই সে যুগের সাহিত্যেও নারী-পুরুষের সম্পর্ক এভাবেই চিত্রিত হয়েছে।

পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা মেয়েদের ভোগ্য বস্তু বলে ভাবতো বলেই তাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রকাশের সুযোগ ছিল না একেবারেই। প্রতিবাদ প্রতিরোধ তো অনেক দূরের কথা! তবু তারই মধ্যে আদি-মধ্যযুগের কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' সমাজ সংসার ও সংস্কারকে মান্য করে রাধা যখন কৃষ্ণের প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করেছে, কৃষ্ণ 'দেবতা' জেনেও বৈকুণ্ঠের মোহকে উপেক্ষা করতে পিছপা হয় নি, তখন তার এই আচরণ সমাজ কর্তৃক প্রশংসিত হওয়ারই কথা। বিশেষত এই সাহসী মেয়েটি কৃষ্ণের পাঠানো পানপাত্র পদদলিত করেছে, তাকে 'রাখাল' বলে তুচ্ছ করেছে, তার 'দূতী' বড়াইকে চড় মেরেছে এবং কৃষ্ণের সঙ্গে নিরন্তর বাকযুদ্ধে নিজের বংশ-মর্যাদা ও আত্মগৌরব প্রকাশে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় নি। তবু সমাজ তাকে কলঙ্কিনীর শিরোপাই দিয়েছে। যে সমাজ তাকে কৃষ্ণের বলপ্রয়োগগত সম্ভোগ থেকে রক্ষা করতে পারেনি, সেই সমাজই মুখিয়ে উঠেছে যখন রাধা ধীরে ধীরে কৃষ্ণকে ভালোবাসতে শুরু করেছে। সিঁদুর বিবাহিত নারীর চিহ্ন, আর এই চিহ্ন নিয়ে রাধার গৌরবও কম ছিল না। মুগ্ধতা ছিল স্বামীর রূপ ও অনুপম দেহকান্তির প্রতিও। তাই কৃষ্ণের 'কু-প্রস্তাবে' কংসের কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করার কথাও রাধা বলেছে।

কৃষ্ণ কিন্তু এসব শুনেও নির্বিকার। কারণ, পুরুষের হাতে-ধরা সমাজ পুরুষকে স্বেচ্ছাচারিতার ছাড়পত্র দিয়ে রেখেছে। এখানে নারীর অভিযোগ-অনুযোগের কোনো মূলই নেই। এই স্বেচ্ছাচারী মনোভাবই কৃষ্ণকে রাধার যৌবন-সম্ভোগে আগ্রহী করেছে, আবার দেহকামনা চরিতার্থ হওয়ার পর রাধাকে ছেড়ে যাওয়ার সময় একইভাবে চালিত করেছে তাকে। রাধা কিন্তু এরকম পরিস্থিতিতেও তার ভালোবাসার স্বীকারোক্তিতে অবিচল থেকেছে। সে যখন পতিব্রতা সতীর মতো পর-পুরুষের প্রেম-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে, আত্মরক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তখন তা করেছে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ীই, আবার যখন কৃষ্ণ-প্রেম নিমগ্না হয়েছে, তখনও তা করেছে নিজের প্রাণ-প্রেরণা থেকেই।- "বাঁশীর শবদেঁ চিত্ত বেআকুল বড়ায়ি জাইবোঁ তার অনুসারে" —এসব দৃষ্টান্তে রাধার স্বাতন্ত্র্য ও আত্মচেতনা প্রকাশিত, যা মধ্যযুগের কোনো নারীর কাছে প্রত্যাশিতই নয় তার সামাজিক ও পারিবারিক সীমাবদ্ধতার কারণে। তাই 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'র রাধা সমাজের গতানুগতিক প্রথাগত বিচারে 'কুলটা' বলে প্রতিপন্ন হলেও নিরপেক্ষ সিদ্ধান্তে নিঃসন্দেহে কিছু অনন্য সাধারণ গুণের অধিকারী।

যে 'Rights of Man' -এর কথা আমরা বলি, তার তালিকায় দীর্ঘ দিন পর্যন্ত শুধু পুরুষের অধিকারই স্বীকৃত হয়েছে। সেখানে রক্ষিত হয়েছে পুরুষের সম্মান, পুরুষ-স্বার্থ। কারণ পিতৃতান্ত্রিকতায় (Patriarchy) নারীর যে যুক্তিবাদী মন ও মনন আছে, মাতা কন্যা বা স্ত্রীর পরিচয়ের বাইরেও বহির্জগতেও তারাও যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, তা একেবারেই স্বীকার করা হয় না। বৈদিক যুগে যজ্ঞানুষ্ঠানে নারীর অধিকার স্বীকৃত হলেও এবং নারীকে কখনো কখনো 'স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোহস্তি কশ্চন' অর্থাৎ 'নারী গৃহের দীপ্তিস্বরূপ', 'গৃহের মধ্যে শ্রী ও স্ত্রী উভয়ের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই' ইত্যাদি বলা হলেও মনুসংহিতার এই উক্তিটির দ্বারাই নারীর জীবন ও কর্ম নির্ধারিত হয়েছিল - 'ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।' তবু এরই মধ্যে নারী যে স্বাতন্ত্র্য খুঁজেছে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে সেই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। প্রসঙ্গত আমরা বেহুলার কথা বলতে পারি। 'মনসামঙ্গলে'র বেহুলা 'খণ্ডকপালিনী' ইত্যাদি তিরস্কারের মধ্যেও শ্বশুরবাড়ি ও আত্মীয়-পরিজনের নিষেধ এবং বিরোধিতা উপেক্ষা করে লখীন্দরের মৃতদেহ ভেলায় নিয়ে ভেসে গেছে জীবনের সন্ধানে। পথ-চলতি নদীর ঘাটে পুরুষের লোভী দৃষ্টি তার শরীর ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু অসামান্য মানসিক শক্তিতে দৃঢ়তার সঙ্গে তা রুখে দিয়েছে বেহুলা।-'যদি কর বিড়ম্বনাঃ দেখ মোর সতীপনা : শাপে ভস্ম করি যাব তোরে।" মাথার উপর ছাদ আর পায়ের তলার মাটি এখন আর বেহুলাকে নিশ্চিন্ত আশ্রয় দিতে পারে না। যৌবন সুখের জন্য কোনো ইশারা সচরাচর কি নারীর কাছে গ্রহণীয় হয়? কিন্তু প্রেমের মূল্যে সে সব কিছু করতে পারে! বেহুলার কাছে লখীন্দরের পুনঃজীবনের প্রত্যাশা ও সংকল্প প্রেমের শক্তিতেই উদ্জীবিত। তার কাছে প্রেম ও প্রাণে কোনো প্রভেদ নেই। মধ্যযুগে মেয়েদের পর্দার আড়াল-ঢাকা জীবনে বেহুলার অভিযান যেন যে কোনো নারীর অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে যাত্রা। মৃত জড়ের মতো পড়ে থাকা পচা গলা সমাজের বিরুদ্ধে সুস্থ সজীব জীবনানুভবের প্রেরণা। একের পর এক নদী-পথ পেরোতে পেরোতে

লখীন্দরের 'গলিয়া পচিয়া গেল সে তনু সুন্দর" দেখেও বেহুলা আশা ছাড়েনি। এবার সে আবেগ-অতিরিক্ত বুদ্ধিতেও শান দিয়েছে। ত্রিবেণী সঙ্গমে এক রমণীকে কাজের সময় শিশুপুত্রকে মেরে ফেলে কাজ-সমাপনে 'পুনরপি জীয়ায় জীবন' প্রত্যক্ষ করে বেহুলা তার সমস্যার সমাধান-সূত্র খুঁজে পেয়েছে- 'মরিয়া জীয়ায় যদি : এই সে পরম নিধি : পাত্র পড়ি করিব জিজ্ঞাসা।" বেহুলা জেনেছে এই নারী আর কেউ নয়,- মনসার সহচরী নেত। ত্রিবেণী সঙ্গমে প্রতিদিন দেবতাদের কাপড় কাচতে আসে। তাই তার শরণাপন্ন হয়ে কৌশলে দেবসভায় প্রবেশ করতে চেয়েছে,- 'মাসী তোমা করি গড়। / তোমার বদলে আমি কাচিব কাপড়।" এরপর দেবতাদের ইচ্ছায় তার নৃত্যগীত পরিবেশন। কুলবধূ ঘোমটার আবরণ, লজ্জা সংকোচ এক লহমায় ঝেড়ে ফেলে বেহুলা নর্তকীর ভূমিকায়। প্রবল মানসিক উৎকণ্ঠার মধ্যেও তার নৃত্যের মুদ্রায় ভুল হয় না, হয় না তাল ভঙ্গ। নাচের সঙ্গে সঙ্গে গান গাওয়ার সময় স্বর ও সুর অবিকৃত থাকে। আমাদের মৃত্যু-নিশ্চিত জীবনে বেঁচে থাকাটাই যেখানে চ্যালেঞ্জ, সেখানে বেহুলা মৃত্যুর বৃত্ত থেকে জীবনকে উদ্ধার করতে প্রয়াসী। নিঃসন্দেহে এ এক কঠিন ব্রত। কিন্তু সে যে একলক্ষ্যাভিমুখী কঠিন সংকল্পে দৃঢ় একাগ্র। চোখের জলকে সংযমের শাসনে বেঁধে আত্মবিশ্বাসী এই মেয়ে শ্বশুর চাঁদ সদাগরকে বলেছে, - 'জীয়াইব কান্ত লখীন্দর।" তার তিন ভাইকেও স্পষ্ট জানিয়েছে- 'প্রভু জীয়াইতে পারি তবে সে আসিব।' সংসারের কল্যাণ-অকল্যাণের দায় নারীর উপর চাপিয়ে দেওয়ার যে অভ্যাস আমাদের প্রায় মজ্জাগত, যা নারীর আত্মবিশ্বাস নষ্ট করার পক্ষে যথেষ্ট, এবং যা তার মধ্যে হীনমন্যতাই তৈরি করে, বেহুলা কিন্তু সে-সব থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছে। কোনো আত্মগ্লানি নয়, দেবসভায় নৃত্য পরিবেশনের সময় হাস্যে-লাস্যে-কটাক্ষে নিজেকে আবেদনময়ী করে তোলার মুহূর্তেও আত্মশক্তিই তার সহায় হয়েছে। কবি জীবনানন্দ তাঁর 'রূপসী বাংলা' কবিতায় বেহুলার নৃত্যকে 'ছিন্ন খঞ্জনা'র নৃত্যের সঙ্গে তুলনা করেছেন, ফুটিয়ে তুলেছেন তার নিরুপায় অসহায়তাকে। বেহুলা তার শোকবিহ্বলতা, ক্লেশ কষ্ট উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যেও স্থৈর্যে অবিচল থেকে দেবতাদের মন-জয়ের চূড়ান্ত চেষ্টা করেছে। মহেশ্বর সুন্দরী বেহুলাকে দেখে আবেগ-চঞ্চল হলে বুদ্ধি করে সেই পরিস্থিতিকেও জয় করেছে সে। বেহুলার ঐকান্তিক একাগ্রতায় দেবী মনসাও লজ্জা পেয়েছেন। মানুষের কাছে দেবতার এ এক অভিনব পরাভব - 'বেহুলা দেখিয়া দেবী হেঁট কৈল মাথা।" বেহুলা কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক নয়। স্বামী লখীন্দরের পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি সে তার ছয় ভাসুরের জীবন ও চাঁদের ডুবে যাওয়া বাণিজ্য তরণী ফিরিয়ে এনেছে। চাঁদ-সনকার সংসার সে আবার ধনে-জনে পূর্ণ করে তুলেছে। যে কল্যাণীরূপ নারীকে মহিমান্বিত করে বেহুলা তারই প্রতিচ্ছবি। তবু কি সমাজ তাকে মহীয়সী বলেছে? বলেনি তো! যার প্রাণ ফিরিয়ে আনার জন্য বেহুলার এই আত্মত্যাগ, তার সেই স্বামীই জীবন ফিরে পাওয়ার পরমুহূর্তে স্ত্রীর কর্মপটুত্বের প্রশংসা তো করেই নি, বরং বেহুলার সতীত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাকে স্বামীর কাছে সতীত্বের পরীক্ষাও দিতে হয়েছে। 'মনসামঙ্গলে'র কোনো কোনো কবি বেহুলার জীবন-সংগ্রামের এই চূড়ান্ত পর্যায়টিও অঙ্কন করেছেন। তবে চাঁদ সদাগরের

মনসা পূজা করার মধ্য দিয়ে বেহুলা প্রকারান্তরে তার শ্রমসাধ্য কর্মেরই স্বীকৃতি পেয়েছে। ইচ্ছাশক্তিকে কাজে লাগালে যে ইচ্ছাপূরণ সম্ভব, বেহুলার জীবন-পণ সাধনায় এই সত্যই প্রতিভাত হয়েছে।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারীর আত্মত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধনা, আত্মচেতনা ও আপন বিবেচনাবুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে কঠিন কর্মে ব্রতী হওয়ার প্রচুর-প্রচুর দৃষ্টান্ত আছে। আমরা চাঁদ সদাগরের পুরুষকারের কথা বলি। কিন্তু বেহুলা নারী হয়েও যে প্রতিকূলতার স্তর অতিক্রমের মধ্য দিয়ে অসাধ্য সাধন করেছে তাতে সে ব্যক্তিত্বে দৃঢ়তায় চাঁদেরই সমতুল্য। 'মৈমনসিংহগীতিকা'তেও এমন অনেক মহৎ গুণের অধিকারী নারী চরিত্র আছে। বলাবাহুল্য, মৈমনসিংহগীতিকা নারী-প্রধানই! এই সব লোকগীতিকায় লোকজীবনের যে বাস্তব চিত্র মুদ্রিত হয়েছে, তাতে মেয়েদের ভূমিকা একেবারে স্বতন্ত্ররূপে চিত্রিত। কবিরা নারীর সামাজিক, পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক নানা প্রতিবন্ধকতার কথা বলেছেন। বলেছেন নারীর প্রতি পুরুষের অন্যায় অবিচারের কথাও। কিন্তু গীতিকার নারী চরিত্র সামাজিক নানা পীড়নের শিকার হলেও তারা অনেক বেশি সংস্কারমুক্ত। স্বাধীন জীবনের প্রতি তাদের যেমন আগ্রহ বা আকর্ষণ আছে তেমনি আছে প্রেমের জন্য বা বৃহত্তর কল্যাণের প্রয়োজনে আত্মত্যাগের আকুতি। নদের চাঁদকে ভালোবেসে মহুয়া তাকে নিয়ে দেশান্তরে পাড়ি দিয়েছে। যদিও সে-পথও কন্টকাকীর্ণ। দুর্জনের কামনাজর্জর আহ্বান মহুয়া যে-রকম শক্ত হাতে মোকাবিলা করেছে নদের চাঁদের জীবনরক্ষা করেছে, তা এক কথায় তুলনা-রহিত। নারী হয়েও পুরুষের মতোই তার সাহস ও কর্মক্ষমতা। সদাগর ও তার মাঝিমাল্লাদের 'পাহাড়ীয়া তস্করের' বিষ দিয়ে পান সেজে খাইয়ে, ডিঙার তলায় কুড়াল মেরে তা ডুবিয়ে উথাল-পাথাল নদীতে বিস্তর সাঁতার কেটে সে আত্মরক্ষা করেছে। রক্ষা করেছে নিজের সতীত্বকে। যে সন্ন্যাসী নদের ঠাকুরকে আশ্রয় দিয়েছিল তার কাছ থেকেও নিজেকে কৌশলে বাঁচিয়ে অসুস্থ নদের চাঁদকে কাঁধে তুলে সে গোপনে পালিয়েছে - 'তেরালেঙ্গা দেহখানি.....জ্বরে করছে সাড়া। /"হাটীয়া যাইতে নাই সে পারে উঠ্যা না হয় খাড়া।। / ভারিয়া চিন্তিয়া কন্যা কি কাম করিল। / আস্তে আস্তে নদ্যার চান্দে কান্দে তুইলা লইল।। / নিশি কালে যায় কন্যা ফিরে ফিরে চায়। / দারুণ সন্ন্যাসী যদি পন্থে লাগাল পায়।।'[৮] মহুয়া তার প্রেমের প্রতি সৎ বলেই নিজের জীবনের চেয়ে প্রেমিকের জীবন তার কাছে অনেক বেশি মূল্য পেয়েছে। হুমরা বেদের দেওয়া বিষলক্ষের ছুরি 'নদ্যার ঠাকুরে'র বুকে বসিয়ে সে নিজের প্রাণরক্ষা করতে পারতো, বিয়ে করতে পারতো সুজনকে। কিন্তু তা সে করেনি। হুমরাকে স্পষ্টই জানিয়েছে 'তোমার সুজনে আমি না করবাম বিয়া।।'[৯] স্বাধীন মতামত প্রকাশের এই দৃঢ় ও দৃপ্ত ভঙ্গী মহুয়া চরিত্রের মহৎ গুণ বলেই স্বীকার্য হওয়ার যোগ্য। প্রেমের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ চন্দ্রাবতীও। জয়ানন্দের কারণে লগ্নভ্রষ্টা হয়ে অন্য কাউকে বিবাহে আগ্রহী সে হয় নি। প্রেমিকের হঠকারিতা তাকে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করেছে - 'রাত্রিকালে শর-শয্যা বহে চক্ষের পানি। / বালিস ভিজিয়া ভিজে নেতের বিছানি।।'[১০] তথাপি বাবাকে সে বলেছে - 'জন্মে না করিব বিয়া রইব আইবর।।'[১১] চন্দ্রাবতীর এই সিদ্ধান্ত তখনকার সমাজ প্রেক্ষাপটের নিরিখে

অপ্রত্যাশিতই বটে! পুরুষের কাছ থেকে বঞ্চনা-প্রাপ্তি নারীর কাছে নতুন কোনো ব্যাপার নয়। বিশেষ করে মধ্যযুগের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক ছিল মূলত শয্যা নির্ভর। সেখানে নারী অন্তরে প্রেম থাকলেও পুরুষের কাছে এর বিশেষ মূল্য ছিল না। নয়ান চাঁদ ঘোষ প্রণীত 'চন্দ্রাবতী' পালায় জয়ানন্দ কিন্তু এদিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমী। অনতিবিলম্বে নিজের ভুল বুঝতে পেরে সে চন্দ্রাবতীর কাছে ফিরে এসেছে। ক্ষমা চেয়েছে পূর্বকৃতকর্মের জন্য। চন্দ্রাবতীর চিত্তও সম্ভবত তাতে দ্রবীভূত হয়েছে। কারণ জয়ানন্দের জন্য তার প্রেম তো উন্মুখ হয়েই ছিল! জয়ানন্দের চিঠি পড়ে পিতার কাছে সে তার হৃদয়-ব্যথা নিবেদন করেছে- 'তুমি সে বুঝিবে আমি দুঃখিনীর ব্যথা।'[১২] কিন্তু পিতার অনুমতি ছাড়া প্রিয়তমের সঙ্গে সাক্ষাৎ তার পক্ষে অসম্ভব! তার জন্য নিজ হৃদয় শতদীর্ণ হলেও নয়! এই বোধ চন্দ্রাবতীর চরিত্রে ভিন্ন মাত্রা নিয়ে এসেছে। পিতৃকুলের মুখ রক্ষা ও পিতার আদেশ মান্য করার মধ্য দিয়ে সে আত্মসুখ জলাঞ্জলি দিয়েছে। নয়তো মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করলেও জয়ানন্দকে ক্ষমা করতে পারতো তার প্রেমেরই শক্তিতে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চন্দ্রাবতীই একমাত্র চরিত্র, যে প্রেমিককে ভুলে থাকার জন্য পিতার নির্দেশে শিবপূজা আর রামায়ণ রচনায় আত্মনিয়োগ করেছে। 'মৈমনসিংহগীতিকা'র নারী চরিত্রগুলি এভাবেই কঠিনে কোমলে মেশানো। দীনেশচন্দ্র সেন 'ভূমিকা'য় বলেছেন— 'পালাগানের অধিকাংশই পূর্ব-মৈমনসিংহের কোন কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।' সেইসঙ্গে এও ঠিক যে, পৌরাণিক কাব্যকথার বাইরে বাস্তব জীবনরস 'মৈমনসিংহ গীতিকা' বা 'পূর্ববঙ্গগীতিকা'তেই বিশেষ ভাবে মূর্ত হয়ে উঠলো। নারীর সাহসিকতা, একনিষ্ঠ প্রেম ও আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তে যে সব গীতিকা সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, সেগুলির মধ্যে 'মলুয়া' উল্লেখযোগ্য। কাজীর কাছ থেকে 'নিখা' করার প্রস্তাবে মলুয়া ভীত শঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু মনোবল হারায় নি। এসব প্রলোভন জয় করার শক্তি মেয়েরা যেভাবে রাখে, কোনো পুরুষসিংহের পক্ষেও অনেক সময়েই তা সম্ভব হয় না। স্বামীকে নিয়ে তার গর্বের অন্ত নেই।— 'আমার সোয়ামী যেমন আসমানের চান।/না হয় দুষমন কাজী নউখের সমান।।'[১৩] এই সাহসী স্পষ্টোক্তির দাম অবশ্য তিলে তিলে শোধ করতে হয়েছে মলুয়াকে। কাজীর ক্রোধ থেকে বিনোদকে বাঁচাবার জন্য কঠিন পণ সে করেছে। বাজি রেখেছে নিজের জীবনকে। তথাপি বিনোদ বিপদমুক্ত হলেও মলুয়ার সতীত্ব নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ির আত্মীয়রা প্রশ্ন তুলেছে। কারণ তারা জাতিতে কুলীন। কৌলীন্যের গর্বে মলুয়াকে 'অসতী' বলতে তারা এতটুকু দ্বিধান্বিত হয় নি। এ পালার সমাপ্তি বিনোদের দ্বিতীয় বিবাহ, ও মলুয়ার চিরপ্রস্থানে। হৃদয় বিদীর্ণ হলেও স্বামীর দ্বি বিবাহে মলুয়ার অসম্মতি ছিল না। – 'সতীনেরে রাখে কন্যা মনের হরষে।। / তথাপি মলুয়া নাহি যায় বাপের বাড়ী।'[১৪], কারণ, 'সোয়ামীর মুখ চাইয়া আমি সকল পাশরি'।। সর্পদংশনে মৃতপ্রায় স্বামীকে বাঁচানোর পরেও সতীর স্বীকৃতি মলুয়া পায় নি। বেহুলার মতো কোনো অলৌকিক উপায় তার ছিল না। সাপের ওঝার শরণাপন্ন হয়েই অসাধ্য সাধনের চেষ্টা সে করেছিল। তবে অতিরিক্ত সম্বল হিসাবে ছিল প্রেমের সঞ্জীবনী সুধা। কিন্তু এত কিছুর পরেও 'মহীয়সী'র শিরোপা তার জোটে নি। বরং

শ্বশুরবাড়ির প্রায় সকলেই 'ঘরেতে না লইব কন্যা জাতিধর্ম্ম ছাড়িয়া'[১৫] – এই সিদ্ধান্তে অবিচল থেকেছে।

তবে মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটে সমাজের দেওয়া অপবাদের বোঝা উপেক্ষা করার দুঃসাহস একমাত্র চন্দ্রানীই দেখাতে পেরেছে। দৌলতকাজীর 'লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যের গুরুত্বপূর্ণ নারীচরিত্র বিবাহ নামক বিধিবদ্ধ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নিজের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করেছে। পিতা-মাতার নির্বাচিত বা কে স্বামী হিসেবে মেনে নিতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না। যদিও সে বামন, খর্বাকৃতি, নিঃসন্দেহে দর্শনধারী নয়, কিন্তু প্রবল পরাক্রমী রণনিপুণ বীর। একজন ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এরকম পাত্র নির্বাচনই তো স্বাভাবিক! তথাপি এখানে একটি 'কিন্তু' থেকে যায়। কারণ চন্দ্রাণী অপরূপা সুন্দরী। তার শিক্ষা-দীক্ষাও আছে। আছে ক্ষত্রিয়োচিত তেজ এবং মানসিক দৃঢ়তা। পুত্রসন্তান না থাকার কারণে রাজ্য ও রাজত্ব রক্ষার্থে চন্দ্রাণীর পিতা বামনের মতো পরাক্রমশালী ব্যক্তিকে জামাতা হিসাবে নির্বাচন করেছেন। তাতে চন্দ্রাণীর পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি ততো গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু চন্দ্রাণী বামনের সঙ্গেই দাম্পত্য যাপন করতে চেয়েছে। অথচ বামন চন্দ্রাণীর প্রতি উদাসীন নির্লিপ্ত। হয়তো নিজের শারীরিক ত্রুটি আড়াল করার জন্যই চন্দ্রাণীর কাছ থেকে সে দূরে দূরে থেকেছে। শেষপর্যন্ত গভীর দুঃখ আর হতাশার মধ্য দিয়ে চন্দ্রাণী জেনেছে তার স্বামী নপুংসক। এই জানার পরই স্বামী-বিচ্ছিন্ন হয়ে অন্যত্র থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে। খুব স্পষ্ট ভাষায় বামন সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার কথা জননীকে জানিয়ে অনুরোধ করেছে — 'ভিন্ন এক মন্দির রচিয়া দেও মোকে।'[১৬] মধ্যযুগের অন্যান্য পতিব্রতা রমণীর মতো ব্যর্থ দাম্পত্যের বোঝা সে বয়ে বেড়াতে চায় নি। সে যুগের সমাজ নিঃসন্দেহে এরকম স্বাধীনচেতা নারীর প্রশংসা করবে না! কারণ মেয়েরা শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। "....The women was obedient, before her marriage to her father, after his death, to her hearest male relative and after her marriage to her husband." হেনরী মেইনও [Henry Maine] 'মনুসংহিতা'র মতো পিতৃতন্ত্রে নারীর স্বাতন্ত্র্যহীন 'বাধ্য' জীবনের কথা বলেছেন। চন্দ্রাণী কিন্তু এরকম কোনো জীবনকে মানতে পারে নি। সে নিজেকে যে স্বামীর কাছ থেকে স্বতন্ত্র করে নিয়েছে, তা কুলের সম্মান নষ্ট করার জন্য নয়। কারণ যে পুরীতে সে থাকে তা উঁচু প্রাচীর ও রক্ষী পরিবেষ্টিত, সুরক্ষিত। চন্দ্রাণী নিজেও সতী নারীর শুচিতা রেখে চলেছে —'কুললজ্জা অন্তস্পট করি নারী রহে। / দক্ষিণ পবনে যেন শরীর না দহে।।'[১৭] বছরে দু'বার পার্বন উপলক্ষে যখন সে মন্দিরে যাওয়ার জন্য পথে বের হতো, তখনও তার দৃষ্টি আকাশ-পথেই নিবদ্ধ থাকতো। তার দৃষ্টিতে কোনো পুরুষ-সন্ধান ছিল না। তথাপি সমাজ তাকে 'মহীয়সী' বলে নি। তার বিড়ম্বিত ভাগ্যের ভাগীদারও হয় নি কেউ। কিন্তু যখন সে লোরকে ভালোবেসেছে, অতৃপ্ত যৌবন-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য তার শরীর-মন উন্মুখ হয়েছে, ধাই বুদ্ধিশিখা যখন তাকে সামাজিক বিধি-নিষেধের কথা বলে সতর্ক করেছে, আর চন্দ্রাণীর স্বামী বামন স্বামীর অধিকারবোধের মানসিকতায় পলায়ন-তৎপর লোর-চন্দ্রাণীর পিছু ধাওয়া

করেছে। বামন ও সমাজের চোখে চন্দ্রাণী 'অসতী' 'কুলটা' ছাড়া আর কিছু নয়। সমাজ ভুলে গেছে এই চন্দ্রাণীকেই ব্যর্থ দাম্পত্যের অভিশাপ পেতে হয়েছে, শারীরিক অথবা মানসিক কোনো দিক থেকেই স্বামীর সান্নিধ্য পায় নি চন্দ্রাণী। লোরের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ও প্রেম একেবারেই অতর্কিত। নতুন কোনো সম্পর্কে আবদ্ধ হওয়ার পূর্ব পরিকল্পনা যে তার ছিল না, সেই দৃষ্টান্ত আমরা আগেই পেয়েছি। কিন্তু হৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় প্রেম চন্দ্রাণীর জীবনে যখন এসেছে তখন তাকে গ্রহণ করেছে সে। এ ব্যাপারে কোনো সংস্কার তার স্বাধীন বুদ্ধি-বিবেচনাকে গ্রাস করে নি। কোনো ধর্ম-অধর্ম, পাপ-পুণ্যের বোধ পীড়িত করে নি তাকে। তবে লোর বামনের আগমন-বার্তায় বিচলিত হয়ে সম্মুখ সমরের সিদ্ধান্ত নিলে চন্দ্রাণী তার পিতৃকুল ও নিজেদের মর্যাদার কথা ভেবে এই উদ্যোগ থেকে লোরকে নিবৃত্ত করেছে – 'করিবা বৈরিতা যুদ্ধ বামনের সঙ্গে।/পৃথিবীতে মোর নাম রহিব কলঙ্কে।।''[১৮] যুক্তি,বুদ্ধি, কর্তব্য, সততা, ব্যক্তিত্ব ও স্পষ্টতা ইত্যাদি নানা গুণের অধিকারী হয়েও চন্দ্রাণী কখনোই সেই গৌরব পায় নি, যে গৌরবে গৌরবান্বিত লোরের প্রথমা পত্নী ময়না। আরাকানের মহা-অমাত্য আশরফ খান দৌলত কাজীকে ময়নাবতীর সতীত্ব কাহিনী-ই লেখার নির্দেশ দিয়েছেন। কারণ ময়না ত্যাগ, কৃচ্ছ্রসাধনা, স্থৈর্য, সংযম ও সতীত্বের প্রতিমূর্তি। সমাজ নারীকে এইভাবেই দেখতে আগ্রহী। নারী যদি পুরুষের অন্যায় আচরণ মুখ বুজে সহ্য না করে, তার জন্য প্রতীক্ষার প্রহর না গোণে, স্বামীর বহুগমনকে পৌরুষের পরিচয় বলে নীরবে মেনে না নেয়, তাহলে 'ভালো' স্ত্রী হিসেবে তার স্বীকৃতি কোথায়? আমাদের সমাজে মেয়েরা দীর্ঘদিন এইভাবেই সতীসাধ্বী লক্ষ্মীমন্ত স্ত্রী হয়ে উঠতে চেয়েছে। যুক্তি-বুদ্ধির ঘরে তালা লাগিয়ে, ব্যক্তিত্বের পায়ে শিকল পরিয়ে পুরুষের দাসীবৃত্তির মধ্যে নারীজন্মের সান্ত্বনা খুঁজেছে। তবু এত কিছুর মধ্যেও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বাধীনচেতা, আত্মসচেতন, ব্যক্তিত্বময়ী নারীর সন্ধান আমরা পেয়েছি। এবং তা শুধু অভিজাত শ্রেণীতে নয়, অন্ত্যজ সমাজেও নারীর আত্মমর্যাদা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় আমাদের বিস্মিত করেছে। প্রসঙ্গত মনে পড়বে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের লখাই ডোমনীর কথা। সে 'সমরসিংহিনী'-ই শুধু নয়, কর্তব্যবোধ, অসীম ধৈর্য ও বিবেচনাবুদ্ধির তীক্ষ্ণতায় 'বাংলা সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র মহিমান্বিত চরিত্র।' লাউসেন হাকন্দে যাওয়ার সময় ময়নাগড়ের ভার কালুডোম ও তার স্ত্রী লখাই-এর উপরই অর্পণ করে গেছে। কিন্তু সমস্যা এই যে, কালুর মদ্যাসক্তি মাঝে মাঝে তাকে কর্তব্যবিমুখ করে। এই পরিস্থিতিতে হাল ধরতে হয় লখাইকেই। প্রবল আত্মবিশ্বাসে মহামদকে সে বলে -'বীরের বনিতা আমি লখে মোর নাম। / বুঝাব বিশেষ যদি বাধাও সংগ্রাম।।'[১৯] কালুর কর্তব্যবোধের অভাব লখাইকে পছন্দ নয়। স্বামীকে সে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য উজ্জীবিত করতে চেয়েছে। গভীর কৃতজ্ঞতাবোধ থেকে লাউসেনের ঋণ শোধ করার কথা স্মরণ করিয়েছে, তাকে-'কোমর বান্ধিয়া নাথ যুঝ একবার।/রণে রাখ পৌরুষ রাজার শোধ ধার।।'[২০] কিন্তু এত চেষ্টাতেও কালুকে যুদ্ধে পাঠাতে না পেরে লখাই পুত্র সাকাকে রণে যাওয়ার কথা বলেছে - 'মোর দুগ্ধ খেয়ে বেটা রণে ভীত হলি।/তু বেটা তখনি তবে হয়ে না মরিলি।।'[২১] সাকা যুদ্ধে গিয়ে আর ফেরে

নি। পুত্রশোকে হৃদয় বিদীর্ণ হলেও লখাই দ্বিতীয় পুত্রকেও যুদ্ধে পাঠিয়েছে। এই আত্মত্যাগ, বৃহৎ স্বার্থে ব্যক্তিস্বার্থকে তুচ্ছ করার প্রাণ-প্রেরণা মধ্যযুগের কাব্যে আর কোনো নারী চরিত্রে লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। এমন নারীকে মহীয়সী বলতে বাধা কোথায়? কিন্তু মধ্যযুগের পুরুষতান্ত্রিক সমাজকাঠামোয় নারীকে এটুকু স্বীকৃতি দিতেও পুরুষের কার্পণ্য ছিল। যদি প্রশস্তিকে নারী প্রশ্রয় বলে মনে করে? যদি স্বাধীন হয়ে ওঠার বাসনায় সমাজ-বিধিকে লঙ্ঘন ক'রে বসে? তাহলে পুরুষ মান হারাবে। তবে কেউ বলুক বা না বলুক আত্মবিশ্বাসী নারী আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি নিজেই নিজের পিঠ চাপড়ে বলে 'নারী তুমি মহীয়সী', তাহলে সেটাই হবে একজন আত্মসচেতন নারীর আত্মবিশ্বাসী মনের যথার্থ আত্মমূল্যায়ন। রবীন্দ্রনাথের 'পলাতকা' কাব্যের 'মুক্তি' কবিতার সেই মেয়েটি, যার জীবন 'বাইশ বছর এক চাকাতেই বাঁধা', আত্মোপলব্ধির আলোকে সেও তো অতঃপর বলতে পেরেছিল– 'আমি নারী, আমি মহীয়সী'।

উল্লেখপঞ্জি

১। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বড়ুচণ্ডীদাস, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, দেজ পাবলিশিং পৃঃ ৩৬২
২। 'মনসামঙ্গল', কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, চিত্রা দেব ও অক্ষয়কুমার কয়াল সম্পাদিত, ১ম সং ১৩৪৮ লেখাপড়া পৃঃ ২৬৮
৩। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৬৮
৪। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৭২
৫। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৭২
৬। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৬০
৭। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ২৭৫
৮। মহুয়া, মৈমনসিংহ গীতিকা, দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত, স্টুডেন্ট ওয়েজ, বাংলাদেশ, ঢাকা, পৃঃ ৮২
৯। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৮৭
১০। চন্দ্রাবতী, ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৮
১১। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৮
১২। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৫৮
১৩। মলুয়া ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৬০
১৪। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১২৩
১৫। ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ১৩৮
১৬। লোরচন্দ্রাণী ও সতীময়না, দৌলতকাজী, দেবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্যসংসদ, ৩য় মুদ্রণ ২০০৩ পৃঃ ৩৮
১৭। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৩৮
১৮। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৭১
১৯। ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তী, পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত, প্রথম সং ১৯৬২, পুনর্মুদ্রণ ২০১২, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, পৃঃ ৬০৩
২০। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬২০
২১। ঐ ঐ ঐ ঐ পৃঃ ৬২৩

....